মুসলিম বিশ্ব আজ

সায়ুযুদ্ধ এর শিকার

কারণ ও প্রতিকার

ড. মোহাম্মদ ওসমান গনি

আরবী ভাষা কোর্স (ফার্ষ্ট ক্লাস)

বি. এ অনার্স (তাফসীর, ফার্ষ্ট ক্লাস) উম্মূল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা, সৌদী আরব।

এম, এ (ফার্ষ্ট ক্লাস) এম, ফিল (এক্সসেলেন্ট) দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পি. এইচ. ডি. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রভাষক, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী



মুসলিম বিশ্ব আজ

স্নায়ুযুদ্ধের শিকার

কারণ ও প্রতিকার

প্রকাশক	মোঃ আমজাদ হোসেন
প্রকাশনায়	**কাশফুল প্রকাশনী** ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯ ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com /kashfulprokasoni
অনলাইন পরিবেশনায়	www.kashfulpro.com www.wafilife.com www.rokomari.com
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ	যিলক্বদ ১৪৪৪ হিজরী, জুন ২০২৩
বানান ও ভাষারীতি	মিজানুর রহমান ফকির
কম্পোজ	ইনাম আহমেদ
প্রচ্ছদ	মোঃ ইয়াসির আরাফাত
মুদ্রণ ও বাঁধাই	**মিডিয়া প্লাস** ২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com
মূল্য	৮০/- (আশি) টাকা মাত্র।
ISBN	.....

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার যিনি আমাদেরকে তার অনুগত বান্দা হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। সালাত সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর উপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের উপর।

বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত নাম স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডা লড়াই। স্নায়ুযুদ্ধ আসলে কি কেনই বা স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদেরকেই টার্গেট করা হচ্ছে। ইসলামের বিরুদ্ধে মুশরিকদের এই বুদ্ধি ও কৌশলে যুদ্ধ শুরু আজ নয়। এ লড়াই নবীগণ যখন মুশরিকদের এক আল্লাহর দাসত্ব করতে দাওয়াত দেন তখন থেকেই। যদিও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতে ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। বর্তমান মুসলিমরা এই লড়াইয়ে সবচেয়ে বড় শিকার। এর কারণ হচ্ছে তাদের ইসলামের মৌলিক শিক্ষা না থাকা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতি মুসলমানদের মাঝে বিস্তার লাভ করা। আমাদের এই স্নায়ুযুদ্ধের কবল থেকে বাঁচতে পড়াশোনা করতে হবে। তাই আমরা "মুসলিম বিশ্ব আজ স্নায়ুযুদ্ধ এর শিকার কারণ ও প্রতিকার" নামে বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। বইটি স্নায়ুযুদ্ধ বিষয়ে আপনাকে মৌলিক ধারণা দিবে বলে আশা রাখি ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত পাঠক আপনাদের কাছে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি ধরা পরলে মেহেরবানী করে আমাদের জানাবেন, ইনশাআল্লাহ পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নিবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এই খিদমতটুকু কবুল করুন এবং পরকালের কঠিন মুসীবতের সময় নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

– প্রকাশক

সূচিপত্র

১. ভূমিকা..... ৫
২. স্নায়ুযুদ্ধ কী ও কেন? ৭
৩. স্নায়ুযুদ্ধের উদ্দেশ্য..... ৯
৪. স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যম..... ১২
৫. স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা..... ১৭
৬. নারী অধিকারের নামে স্নায়ুযুদ্ধ..... ২০
৭. ইসলামের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন..... ২৩
৮. পরিকল্পিত আক্রমণে মিডিয়ার প্রভাব..... ২৯
৯. পশ্চিমাদের উত্থাপিত অভিযোগের মাধ্যমে আক্রমণ..... ৩০
১০. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মিশনারি তৎপরতা..... ৩৪
১১. ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ও মতবাদ তৈরি..... ৩৬
১২. স্নায়ুযুদ্ধের আক্রমণের অংশ হিসেবে হাদিস অস্বীকার করা, হাদীস জালকরণ এবং বিভিন্ন যুগে এর আক্রমণের ধরন..... ৪০
১৩. সংকট নিরসনে শিক্ষা..... ৪৭
১৪. স্নায়ুযুদ্ধের কবল থেকে মুক্তির উপায়..... ৫১

ভূমিকা

اَلحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ وَبَعْدُ....

সকল প্রশংসা সেই মহান করুণাময় আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমাদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নবী প্রেরণ করেছেন, নাযিল করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট কিতাব এবং প্রদান করেছেন পরিপূর্ণ শরীয়ত। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে এসেছেন।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের প্রতিপক্ষ স্নায়ুযুদ্ধের কবলে ফেলে দিয়েছে; কারণ তাদের একমাত্র শত্রু হচ্ছে ইসলাম ও মুসলিম।

শত্রুরা মুসলিমদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য ক্রমাগত ভীতিপ্রদর্শন, গুজব, অপপ্রচার ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের শক্তিকে বিশাল আকারে প্রকাশ করে থাকে। অথচ এই অপপ্রচারের পিছনে ততটা বাস্তবতা নেই। তাদের এই চক্রান্ত নস্যাৎ করে বিজয় লাভের জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় ঈমান, পাহাড়সম ধৈর্য এবং পরিপূর্ণ তাক্বওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

"আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের কোনো চক্রান্তই তোমাদের ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।" [সূরা আলে ইমরান: ১২০]

আমাদের মাঝে এক শ্রেণির লোক রয়েছে, তারা প্রতিপালিত হয়েছে শত্রুদের কোলে। তারা শিক্ষা পেয়েছে পশ্চিমাদের কাছ থেকে। তাদের মস্তিষ্কের খোরাক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তারা স্বদেশে বসে পশ্চিমাদের জয়গান গায় এবং তাদের তথাকথিত সভ্যতার বাস্তবায়ন ঘটাতে চায়। এরা মূলত ইসলাম ও মুসলিমদের চরম শত্রু।

এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাসীদের সংখা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি; কারণ মুসলিম উম্মাহর বিশ্বাস ও চরিত্র ধ্বংস করার জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিছক মনগড়া প্রমাণাদি ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণা প্রচার ও প্রসার করেই যাচ্ছে।

আমরা বিশ্বাস করি ব্রিটিশরা ইসলামী রাষ্ট্র থেকে বিদায় নিয়েছে ঠিকই কিন্তু এই উম্মাহর মাঝে ফাসাদ, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সিলেবাস, সামাজিকতায় কৃষ্টিকালচার ও বিচার বিভাগসহ তাদের রেখে যাওয়া সবকিছুই অব্যাহত রেখেছে এবং অদ্যাবধি চলছে।

আমি বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে The Intellectual War and its Ways সম্পর্কে লেকচার দিতে গিয়ে বিভিন্ন আরবি কিতাব ও প্রবন্ধসহ পত্র-পত্রিকার তত্ত্ব ও তথ্য এবং ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের সহপাঠি শিক্ষক মহোদয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় লেকচারশীট তৈরি করেছি, যা জাতির সামনে তুলে ধরা একান্ত জরুরী মনে করছি। কয়েকটি লেকচারশীট একত্রিত করে **"মুসলিম বিশ্ব আজ স্নায়ুযুদ্ধের শিকারঃ কারণ ও প্রতিকার"** নামে এ পুস্তিকাটি শিক্ষার্থী ও পাঠকবৃন্দের হাতে তুলে দিচ্ছি। একত্রিকরণ ও সাজানো ছাড়া আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সকল কৃতিত্ব সেই মহান করুণাময় আল্লাহর।

পৃথিবীতে আবারও ইসলামের বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম প্রত্যাবর্তন প্রমাণ করে যে, অচিরেই বিশ্বে খালেস ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা হবে, ভবিষ্যৎ কেবল ইসলামেরই। আমরা আশাবাদী, অচিরেই উম্মতের ওপর আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হবে। আল্লাহর দরবারে আমাদের আকুতি, তিনি যেন আমাদের স্নায়ুযুদ্ধের কবল থেকে দূরে রাখেন এবং আমাদেরকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যে মনোবল আমাদেরকে সম্মুখপানে এগিয়ে নিবে, কখনো পিছপা হতে দিবে না। আমিন!

ড. মোহাম্মদ ওসমান গণি

স্নায়ুযুদ্ধ কী ও কেন?

স্নায়ুযুদ্ধ পরিচয়:

স্নায়ুযুদ্ধ হচ্ছে Intellectual War যার আরবি হচ্ছে اَلْغَزْوُ الْفِكْرِيُّ আল গাযউল ফিকরী বা বুদ্ধি ও কৌশলের যুদ্ধ। পরিভাষায় বলা যায়– স্নায়ুযুদ্ধ এমন যুদ্ধ যাতে সৈন্যবাহিনী ও অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। কোনো ধরনের রক্তপাত হয় না।

অর্থাৎ এমন প্লান ও পরিকল্পিত কাজ যা মানবজীবনে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও চারিত্রিক জীবনে প্রভাব ফেলে। এ কাজটি ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে মুসলিমদেরকে তাদের দীন থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করে, তাদের সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে এবং তাদের শক্তিকে দুর্বল করে তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, চায় সেটি সরাসরি হোক কিংবা গোপনীয়ভাবে হোক; রাজনৈতিকভাবে হোক কিংবা অরাজনৈতিকভাবে হোক; সেটি মিলেটারি দিয়ে হোক কিংবা মিলেটারি ছাড়া হোক। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সবচেয়ে বড় সংকট হচ্ছে পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেয়া স্নায়ুযুদ্ধ।

স্নায়ুযুদ্ধ কেন?

- ❖ আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম।
- ❖ আকীদা হিসেবে ইসলামই শ্রেষ্ঠ।

- ❖ আদর্শ হিসেবে ইসলামই চির অনুসরণীয়।
- ❖ যতদিন আল-কুরআন পৃথিবীর বুকে অবশিষ্ট থাকবে ততদিন মুসলিমদেরকে ধোকা দেয়ার আশা করা ঠিক হবে না।
- ❖ অস্ত্র দিয়ে সরাসরি ইসলামের মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোনো জাতির নেই।
- ❖ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলিমদের ওপর বিজয় লাভ করা সম্ভব নয়।
- ❖ মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে অতীতে ও বর্তমানে ইয়াহুদী জাতি সবচেয়ে বড় চক্রান্ত করেছে। তাদের এই চক্রান্তের কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছে স্নায়ুযুদ্ধকে।
- ❖ মিলেটারি ও অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের চেয়ে স্নায়ুযুদ্ধ হচ্ছে হাজার ও লক্ষগুণ বিপদজনক।
- ❖ স্বাধীনতা, প্রগতি ও যুগের চাহিদার নামে বর্তমান মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করা হচ্ছে এ স্নায়ুযুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য।
- ❖ মুসলিম জাতিসত্তা ও দীনি ফিতরাত নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধের আঘাতের মূল লক্ষ্য।
- ❖ মুসলিম প্রজন্মকে অচল করে দেয়া হচ্ছে এ স্নায়ুযুদ্ধের আসল টার্গেট।

স্নায়ুযুদ্ধের উদ্দেশ্য

স্নায়ুযুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রধাণত দুটি:

প্রথম উদ্দেশ্য: মুসলিমদের ঘরের বাহিরে ইসলামের প্রকৃত রূপ বা অবস্থা প্রসারিত হতে বাধা প্রদান করা। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে, ইসলাম একটি আদর্শ দীন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র দীন।" [সূরা আলে ইমরান: ১৯]

এ দীনই মানবজাতিকে প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন চাপ ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত করেছে এবং মানবজাতিকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে পরিণত করেছে।

১. তাই তারা প্রথম উদ্দেশ্য বাস্তবায়েনে ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে বিভিন্ন মিথ্যা ছড়ায়। যেমন- তারা বলে: ইসলাম অন্যান্য ধর্ম থেকে সংগৃহীত, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়নি ইত্যাদি। এর মাধ্যমে তারা ইসলাম অনুসারীদের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাতে চায় এবং তাদের উদ্দেশ্য এই দীনের প্রভাব যেন তাদের অন্তরের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে।

২. ইসলামী সমাজে মুসলিমদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বড় করে তুলে ধরে ইসলামের ওপর নিক্ষেপ করে বলে এটাই হচ্ছে ইসলাম। আমরা দৃঢ়তার সাথে এটা অস্বীকার করি যে, মুসলিমদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতার জন্য দায়ী ইসলাম নয়। মুসলিমদের অনুন্নতি ও ব্যর্থতা তাদের ত্রুটি। এটা ইসলামের ত্রুটি নয়।

৩. তারা ইসলামকে এমনভাবে চিত্রায়িত করে যে, ইসলাম কঠোর ও হত্যা-রাহাজানির ধর্ম। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তরবারির মাধ্যমে। ইসলামের অনুসারীরা হচ্ছে জংলী হিংস্র। তাদের কোনো দয়া-মায়া নেই। তারা চোরের হাত কেটে দেয়, যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করে ও হত্যাকারীর ওপর কিসাস প্রয়োগ করে।

৪. তারা এমনভাবে ইসলামের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরে যে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো ত্রুটিযুক্ত। যেমন- তালাক, একাধিক স্ত্রী ইত্যাদি।

৫. তারা ইসলামে অপবাদ দেয় যে, ইসলাম তার অনুসারীদের মাঝে তাদের মেধা ও আবিস্কারের শক্তি অকার্যকর করে দেয়।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য: ইসলামকে তার ভেতর থেকেই আঘাত করা। মুসলিমদের মাঝে আকীদাগত পার্থক্য উস্কে দেয়া। যেমন- খারিজী দলের আত্মপ্রকাশ, কাদিয়ানীদেরকে সাহায্য করা, বাহায়ীয়া দলকে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মুসলিম যুবক-যুবতীদের আকীদা নষ্ট করা, তাদের চরিত্র ধ্বংস করা, তাদের দীনের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি করা ও তাদের মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে হিংসা ও অনিহার বীজ বপন করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"আর ইহুদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১২০]

আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

“তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে আর আমিও ভীষণ কৌশল করি। অতএব, কাফিরদেরকে অবকাশ দিন; তাদেরকে অবকাশ দিন কিছুকালের জন্য।” [সূরা আত-ত্বারিক: ১৫-১৭]

আল্লাহ আরও বলেন

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ

“নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে, তারা আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে নিবৃত্ত করার জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।” [সূরা আল-আনফাল: ৩৬]

স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যম

শত্রুরা বর্তমান মুসলমিদের দুর্বলতার উৎস ভালোভাবেই জেনে গিয়েছে। এজন্য তারা মুসলিমদের পরাজিত করতে সে পথেই অগ্রসর হচ্ছে। আর তাদের দুর্বলতার সে উৎস হলো নফস্ বা কু-প্রবৃত্তি।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নবম লুইস মিসর আক্রমণের সময় আল-মানসুরায় বন্দী হয়। অতঃপর তাকে চার বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। বন্দী জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে সে মুসলিমদের মানসিক অবস্থা ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। মুক্তির পর স্বদেশে সে তার জাতিকে বলেছিল, "সমর শক্তিতে কখনোই তোমরা মুসলমিদেরকে পরাস্ত করতে পারবে না। তাদেরকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় নারী ও সুপেয় শরাবের পেয়ালা।"

মিঃ লুইসের দেয়া এ তথ্যই শত্রুরা আজ কাজে লাগাচ্ছে। শত্রুরা তাদের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে এ পথটি বেছে নিয়েছে। প্রবৃত্তির তাড়নার এ ঘৃণিত পথেই তারা মুসলমিদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন- 'আল মাসুনিয়া'র মত সংগঠনগুলো অতি ঘৃণিত পথে তাদের কার্যসিদ্ধি করে থাকে। তারা বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত করে। সমাজের বড় বড় ব্যক্তি ও সরকারি উপরস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই এতে উপস্থিত হয়। এ সকল সংগঠনের লক্ষ্য হলো, মুসলিম বিশ্বের বড় বড় ব্যক্তিত্বকে ঘায়েল করা এবং তাদের চরিত্রে কালিমা লেপন করা। দাওয়াত পেয়ে নেতৃবর্গ সম্মেলনে যোগ দেন। সেখানে মদ ও নারী দেয়া হয়। এছাড়াও তাদের কু-প্রবৃত্তি চাঙ্গা করে কোনো রূপসীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয় এবং তা ক্যামেরাবন্দি করে মূলত তাদেরকে জিম্মি করে রাখা হয়।

তারপর এসব ছবি বা ভিডিওকে পুঁজি করে শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার সুযোগ লাভ করে। এ সুযোগে তারা মুসলমিদের গুরুত্বপূর্ণ ও সংরক্ষিত স্থানগুলোতে তাদের লোক নিয়োগের প্রস্তাব করে। যেমন- তারা বলে: 'আমাদের সুশিক্ষিত অমুক ব্যক্তিকে আপনার অমুক দপ্তরে নিয়োগ দিতে হবে এবং তার পদ হতে হবে সর্বোচ্চ। আমাদের এ প্রস্তাবে আপনি অসম্মত হলে আপনার এ ভিডিও আমরা সারা বিশ্বে প্রচার করে দিব। নেতার পক্ষে তখন ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় না। ফলে বাধ্য হয়েই তাকে তা মেনে নিতে হয়। অন্যথায় তার ইজ্জত-সম্মান সবই শেষ হয়ে যাবে!

অনুরূপভাবে নেতৃবৃন্দের জাতীয় অর্থ আত্মসাৎ, উৎকোচ গ্রহণের প্রমাণ শত্রুদের হাতে থাকে, যার কারণে নেতৃবৃন্দ তাদের কাছে জিম্মি হয়ে থাকেন। আর তাদের এ দুর্বলতার সুযোগে শত্রুরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়।

স্নায়ুযুদ্ধের মাধ্যমসমূহ

১. মুসলিমদের মাঝে বিশ্বাসগত বিভেদকে উস্কে দেয়া।

২. সঠিক আকীদাকে নষ্ট করা এবং তা সন্দেহ ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়া। যেমন,
   - কুরআন হচ্ছে মাখলুক।
   - আল্লাহ তাআলা মূসা 'আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেননি।
   - আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম 'আলাইহিস সালামকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেননি।

৩. পুরাতন যুগের দলের পরিবর্তে অত্যাধুনিক নতুন নতুন পক্ষপাতিত্ব তৈরি করা। যেমন-
   - জাতীয়তা
   - গণতন্ত্র
   - সমাজতন্ত্র

৪. দীনের বিরোধী মতবাদ ও চিন্তা-ধারাকে উপস্থাপন করা। যেমন-

- ধর্মনিরপেক্ষ
- বিবর্তনবাদ
- বস্তুবাদ

৫. ইসলাম বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা ও সহযোগিতা করা। যেমন-

- কাদিয়ানী (নবী দাবিদার)
- বাহাইয়া (সুদকে হালাল)
- শীয়া (ব্যভিচারকে হালাল)

৬. ইহুদী গুপ্ত সংঘের কোর্সে প্রবেশ ঘটানো আর তা বিভিন্ন ধোঁকার ব্যানারে। যেমন-

- মাসুনিয়াহ
- ক্যাসিনো
- নাইটক্লাব বা লায়ন্সক্লাব

৭. স্নায়ুযুদ্ধের প্রচারে স্থাপন করা মিডিয়া। যেমন-

- রেডিও
- টেলিভিশন
- ইন্টারনেট

৮. মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভক্তিকরণের উদ্দেশ্যে

- জেনারেল শিক্ষা
- আলিয়া শিক্ষা
- কওমি শিক্ষা

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ইসলামের শত্রুরা সব ধরনের পন্থার মাধ্যমে ইসলামকে অবরোধ করতে চেষ্টা করে। একটি ব্যর্থ হলে আরেকটি হয়তো কিছুটা কাজে লাগে। সরাসরি করতে না পারলে গোপনে প্রবেশ ঘটায়। বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যানারে যার বাহ্যিক সুন্দর বাণী, ভিতরে নষ্টের ষড়যন্ত্র রয়েছে এবং এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

মুসলিম নেতৃবৃন্দ যদি মদ ও নারীর হাতছানিতে আত্মভোলা না হতেন, ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণ করে নিজেদের চরিত্রকে কলঙ্কিত না করতেন তাহলে তারা স্বাধীন ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারতেন। শত্রুরাও তাদের কার্যসিদ্ধিতে সফল হতে পারতো না এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতো না।

স্নায়ুযুদ্ধের অস্ত্রসমূহঃ

শিক্ষার অস্ত্রঃ

- শিক্ষা সিলেবাস
- বিশেষ স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটি
- বিশেষ সংস্থা ও মিশন

ধর্মীয় অস্ত্রঃ

- কাদিয়ানী
- বাহায়ী
- শীয়া
- নাস্তিক্যতাবাদী

সামাজিক অস্ত্রঃ

- নারী আন্দোলন
- জন্মনিয়ন্ত্রণ
- পরিবার পরিকল্পনা

মিডিয়া অস্ত্রঃ

- পত্রিকা
- সিনেমা
- রেডিও-টেলিভিশন
- ইন্টারনেট, কার্টুন ইত্যাদি

অর্থনৈতিক অস্ত্রঃ

- অর্থনৈতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা
- অর্থনৈতিক ঋণ ও সহযোগিতা

এছাড়াও তাদের অন্তরে যা গোপন করেছে তা আরও বিরাট। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

"তাদের মুখে বিদ্বেষ প্রকাশ পায় এবং তাদের হৃদয় যা গোপন রাখে তা আরো গুরুতর। তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি, যদি তোমরা অনুধাবন কর।" [সূরা আলে ইমরানঃ ১১৮]

আল্লাহ আরও বলেন,

وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও (তাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে) কৌশলী করেন; আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী। [সূরা আল-আনফালঃ ৩০]

স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ যেদিন ইবলিশ অমান্য করেছিল সেদিন থেকে এই স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয় এবং এর ধারাবাহিকতা আজ পর্যন্ত চলছে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿۱۲﴾

"তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কি তোমাকে নিবৃত্ত করল যে, তুমি সাজ্‌দাহ্‌ করলে না? সে বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আল-আরাফ: ১২]

এখানে ইবলিশ বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তর দিয়েছিল। শুধু তাই নয় বরং পরবর্তীতে সে তার কুচক্রী ষড়যন্ত্র সর্বদাই অব্যাহত রেখেছে। আদম ও হাওয়াকে বন্ধু সেজে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আক্রমণ করেছে।

কুরআনুল কারীমে এসেছে,

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰىكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَ قَاسَمَهُمَاۤ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۱﴾

তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, যাতে তোমরা উভয়ে ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হও, এ জন্যেই তোমাদের রব এ গাছ থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। আর সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, নিশ্চয় আমি তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের একজন।" [সূরা আল-আরাফ: ২০-২১]

নূহ ‘আলাইহিস সালামের সময় কতিপয় নেককার লোকের মৃত্যুর পর ইবলিশ সেই সমাজের মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে শিরকের সূচনা করেছিল।

ইব্রাহিম ‘আলাইহিস সালাম মানুষদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থায় দাওয়াত দিয়েছিলেন।

আল্লাহর ইচ্ছায় মারইয়ামের গর্ভে যখন ঈসা ‘আলাইহিস সালাম আগমন করেছিলেন তখন মানুষেরা এটাকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ শুরু করেছিল। সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়

মক্কার কাফেররা নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শিক দিক থেকে না পারলেও পেশিশক্তি দ্বারা, তারপর বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে আক্রমণ চালিয়েছিল। সে সময়ের কাফেররা বলতো-

১. একজন সাধারণ মানুষ আবার রাসূল হয় কি করে? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ জানিয়েছেন,

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْاَسْوَاقِ

“আরও তারা বলে, ‘এ কেমন রাসূল’ যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে।” [সূরা আল-ফুরকান: ৭]

২. ভীতিপ্রদর্শন করেছে নানাভাবে। পরে আবু তালিবের মাধ্যমে নানা প্রলোভন দেখিয়েছেন।

৩. ঠাট্টা, হাসি-তামাশা, বিদ্রূপ ও কথা দিয়ে মানসিকভাবে আক্রমণ করেছে। বর্তমানে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী, প্রগতিবিরোধী ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছে ইসলাম অনুসারীদেরকে।

৪. কুরআন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করেছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

আর কাফেররা বলে,“তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শোনো না এবং তা আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।” [সূরা হা-মীম সাজদা, আয়াত: ২৬]

বাংলাদেশে যখন শিক্ষিতের হার ছিল ৫% তখন নিয়মিত কুরআনের পাঠক ছিল ৬০% থেকে ৬৫%। আর এখন শিক্ষিতের হার ৬০% থেকে ৬৫% হওয়ার পরেও কুরআনের পাঠক মাত্র ৫% থেকে ৬%। বর্তমানে কুরআনকে সরাসরি তালিম না দিয়ে 'কিতাবের তালিম' নামে এক জঘন্য প্রথা চালু করা হয়েছে।

৫. হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরতকারী মুসলিমদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা। সেখানে হিজরতকারী পুরুষ ছিল ৮৩ জন ও মহিলা ছিল ১৯ জন। মোট ১০২ জনকে ফিরিয়ে আনার জন্য কাফেররা প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন আবি রাবিয়াহ ও আমর বিন আল-আসকে পাঠায়।

৬. প্রলোভন দেখানো হয়েছিল আপোষমূলক সমাধানের লক্ষ্যে। কাফেরদের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উতবাহ, শাইবা, আবু সুফিয়ান, নদর বিন হারিস, উমাইয়া, খালিদ ও আবু জাহেল প্রমুখ। এরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী দিতে চেয়েছিল।

হিজরতের পরে মদিনায়

৭. আবদুল্লাহ বিন উবাই Hypocrisy এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। প্রকাশ্যে সে ইসলামের বাধা হয়নি।

৮. আউস ও খাজরাজ গোত্রীয় দ্বন্দ্ব উস্কে দেয় ইয়াহুদী বৃদ্ধ শাস বিন ক্বায়েস।

৯. যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছার আগে বসরা থেকে ফিরে এসেছিল ৩০০ জন।

১০. আনসার-মুহাজির দ্বন্দ্ব (বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পর)।

১১. আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছিল।

অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকজন নবী রাসূলের কয়েকটি ঘটনার মাধ্যমে 'নবী-রাসূলদের সময়ে Intellectual War সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। Intellectual War চলবে হক্ব ও বাতিলের সঙ্গে।

নারীর অধিকারের নামে স্নায়ুযুদ্ধ

স্নায়ুযুদ্ধের কৌশল হিসেবে বলা হয় ইসলাম নারীদেরকে তাদের যাথাযোগ্য অধিকার দেয়নি, বরং তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই বর্তমানে ইসলামের প্রতিপক্ষরা নারীবাদী নানা সংগঠন নারী-পুরুষের সমান অধিকার চায়। তারা জানে না যে, ইসলামই নারীকে একমাত্র অধিকার, সম্মান ও উচ্চমর্যাদা দিয়েছে। কুরআন-হাদিসে আদল ও ইনসাফ ভিত্তিক নারীর ন্যায্য অধিকার দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষকে সৃষ্টিগত ও প্রকৃতগত কিছু পার্থক্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে মানবসভ্যতা টিকে থাকতে পারে এবং পৃথিবীতে প্রজন্মের ধারাবাহিকতা পরিপূর্ণ স্নেহ ও মমতা দিয়ে পরস্পর পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। তা নাহলে মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য।

প্রথমত: আমরা জানবো পশ্চিমা বিশ্ব নারীদের কি অধিকার দিয়েছে? অধিকারের নামে জাতিকে তারা উপহার দিয়েছে:

- অবৈধ যৌন চর্চা
- লিভ টুগেদার
- কুমারী মাতা
- এইডস রোগ
- সমকামিতা
- মাদকাসক্তি
- বিবাহের প্রতি অনিহা
- পারিবারিক জীবন ধ্বংস
- সামাজিক বিপর্যয় ও
- জারজ সন্তানের সমাজ

এগুলো বাস্তবায়নের জন্য তারা পিতা-মাতার হাত থেকে মেয়েদেরকে ১৮ বছর বয়স হলেই শয়তানের হাতে তুলে দেয়।

দ্বিতীয়তঃ দেখতে হবে জাহিলি যুগে নারীদের অধিকার কেমন ছিল? জাহিলি যুগে

- সর্বস্তরে মেয়েরা চরম যুলুম-নির্যাতিতা ছিল।
- মেয়েদের কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছিল না।
- তাদের কোনো উত্তরাধিকার ছিল না।
- কন্যাসন্তান জন্ম হলে তাদের মুখ কালো হয়ে যেতো।
- কন্যাসন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো।
- এমনকি কন্যাসন্তানদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না।

তৃতীয়তঃ আমি প্রশ্ন করি পৃথিবীর কোনো অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে নারীদের মাঝে সমান অধিকার আছে?

- রাজরানী ও চাকরানীর অধিকার কি সমান? অথচ তারা উভয়ই মেয়ে।
- যে জানে আর যে জানে না তাদের অধিকার কি সমান?
- যে ভালো আর যে মন্দ তাদের অধিকার কি সমান?
- যে কাজ করে আর যে কাজ করে না, তাদের অধিকার কি সমান?
- একজন অফিসার আর আরেকজন ঝাড়ুদার তাদের অধিকার কি সমান?

এই যদি হয় দুনিয়ার নীতি, তবে কীভাবে নারী-পুরুষের মাঝে সর্বক্ষেত্রে সমান হতে পারে? আল্লাহ নারীদেরকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। তাই তাদেরকে দয়া, শ্রদ্ধা ও সম্মান কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশি দিয়েছেন। আবার খরচের দায়-দায়িত্ব যেহেতু পুরুষের ওপর এবং তাদের অর্থের বেশি প্রয়োজন তাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদেরকে অর্থ একটু বেশি দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর বিধান আদল ও ইনসাফভিত্তিক হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

চতুর্থ: এবার দেখবো ইসলাম নারীদেরকে কী অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছে?

আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে আদল ও ইনসাফের ভিত্তিতে যথাযথ মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছেন।

- বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত মেয়েদেরকে তার পিতা প্রতিপালন করবে।
- বিবাহের সময় স্বামীর কাছ থেকে মোহরানা পাবে।
- বাবার সম্পদের অংশ পাবে, স্বামীর সম্পদের অংশ পাবে এবং অংশ পাবে মা, ভাই, ছেলের সম্পদের।
- ইসলাম কোনো ধরনের খরচের দায়-দায়িত্ব মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি।
- মাকে পিতার চেয়ে তিন গুণ বেশি মর্যাদাবান করেছে।
- তিনজন মেয়ে যার রয়েছে তার জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে। এমনকি যার দুজন অথবা একজন মেয়ে রয়েছে সে এমন সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- মেয়েদেরকে সুন্দরভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে।

অতএব, একমাত্র আল্লাহর বিধানেই সর্বপ্রথম নারীদেরকে যথাযথ মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে।

তারা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয় পশ্চিমাদের অনুসরণে নাম দিয়েছে 'নারী স্বাধীনতা'। সত্যিকার এটা যদি নারী স্বাধীনতা হতো তাহলে আমরা মুসলিমরা তাকে অভিনন্দন জানাতাম। কারণ মহান করুণাময় আল্লাহর দীন ইসলাম সর্বপ্রথম নারীদেরকে যুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে কালচার (Culture)। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে যত নিয়মাবলি, বিধি-ব্যবস্থা পালনীয় হয় তাকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে।

আধুনিক বিশ্বে ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করেছে সাংস্কৃতিক হামলা তার অন্যতম।

কোনো মুসলিম এ হামলার শিকার হলে প্রথমে তার ঈমান দুর্বল হয়। আর ঈমান দুর্বল হলে তার আমল কমে যায়। আস্তে আস্তে মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়। ফলে হারাম-হালাল ও পাপ-পুণ্যের ধার সে ধারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ
أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

"আর আমরা তো বহু জিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দ্বারা তারা শোনে না; তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো, বরং তার চেয়েও বেশি বিভ্রান্ত। [সূরা আল-আরাফ: ১৭৯]

সাংস্কৃতির এই আক্রমণেই মুসলিমদেরকে শেখাচ্ছে খাও দাও ফুর্তি করো। পৃথিবীর বাইরে আর কোনো জগত নেই। নেই কোনো জবাবদিহিতা, তাদের পোশাক হচ্ছে উন্নত জীবন মানের। নারীদেরকে শেখানো হচ্ছে অশ্লীলতা, নির্লজ্জতা, চরিত্রহীনতা ও বেহায়াপনা। তারা মানুষকে বানাতে চায় চতুষ্পদ জন্তু ন্যায়, যারা কাজ করে শুধু তাদের শরীর, পেট ও শারীরিক চাহিদার জন্য।

এ ছাড়া পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতা সংস্কৃতি সত্যিকার কোনো জাতিকে কিছুই দিতে পারেনি।

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেকড় উপড়ে ফেলে শুধু পশ্চিমা সভ্যতাকে মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে।

রেডিও, টেলিভিশন, পেপার-পত্রিকা ও ইন্টারনেটকে হাতিয়ার বানিয়ে এর মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে চারিত্রিক অবক্ষয়, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

পাশ্চাত্যে অবিবাহিত যুবকদের মেয়ে বন্ধু ও অবিবাহিত মেয়েদের পুরুষ বন্ধু একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা যেন ক্রমশ অংকের হিসাবকে হার মানাতে বাধ্য করছে। পাশ্চাত্যের কোনো কোনো তথাকথিত উন্নত ও সভ্য দেশে প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে তিনটিই অবৈধভাবে জন্ম লাভ করছে।[১]

লিভ টুগেদার (এক সঙ্গে থাকা) নাইট টুগেদার (এক সঙ্গে রাত্রিযাপন করা) এর খারাপ পরিণামে সমাজব্যবস্থা ধ্বংস ও পঁচন সৃষ্টি করে। এর পাশাপাশি

- বংশ ধারাহিকতার বিপর্যয় ঘটে।
- লজ্জা-শরম উঠে যায়।
- মনুষত্ব বলে কিছুই থাকে না।
- এটি সমাজে অশান্তি সৃষ্টির নীরব হাতিয়ার।
- এটি জঘন্য অপরাধ।

এক শ্রেণির মুসলিম যারা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের বিভিন্ন অমুসলিম দেশে লেখাপড়া করতে যায় এবং সেসব দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। তারা ভালো-মন্দের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। বিজাতিদের জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তাদের তথাকথিত সভ্যতার মাঝে পার্থক্য নিরূপণে তারা অক্ষমতার পরিচয় দেয়। ফলে পাশ্চাত্যের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সবকিছুই তারা গ্রহণ করে স্বদেশে আমদানি করে।

---

১ শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা, ১৮৩।

বস্তুত পাশ্চাত্য জগত যান্ত্রিক দিক দিয়ে উৎকর্ষ সাধন করলেও নৈতিকতা ও মানবিকতার ক্ষেত্রে তারা একেবারেই পিছিয়ে। তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির যে চিত্র আমরা অবলোকন করছি, তা নিতান্তই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির।

কিন্তু যদি তাদের মানবিকতা ও নৈতিকতা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় এবং তাদের কৃষ্টি-কালচার, রীতিনীতি ও সার্বিক জীবনপ্রণালী গভীর দৃষ্টিপাত করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে রয়েছে।

এককথায় বিজাতিদের উন্নতি ও অগ্রগতি কেবল যান্ত্রিক সভ্যতার, মানসিক সভ্যতার নয়। পক্ষান্তরে আমাদের রয়েছে একটি পরিপূর্ণ দীন, যার আদলে জীবন গড়ার মাধ্যমে আমরা মানবিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা কারো মুখাপেক্ষী নই। হ্যাঁ, প্রয়োজনে যান্ত্রিক বিষয়ের জ্ঞান তাদের কাছ থেকে নিয়ে তা আল্লাহর আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করতে পারি।

অনেকে এমন রয়েছে হালালকে হালাল, আর হারামকে হারাম বলতেও সংকোচবোধ করে। বিশেষ করে যখন তারা কোনো অমুসলিমের মুখোমুখী হয়, আর তাকে কোনো হারাম জিনিস অফার করা হয় কিংবা কোনো হারাম কাজের প্রতি আহ্বান করা হয় তখন তা 'নো থ্যাংকস' অথবা এ জাতীয় কিছু বলেই ক্ষান্ত হয়। তারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করে একথা বলতে নারাজ যে, আমি মুসলিম, আমার ধর্মে এটা হারাম ও গর্হিত কাজ।

আবার অনেকে এমনও রয়েছে, যারা তাদের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পায় এই আশঙ্কায় যে, তাকে গোড়া, সাম্প্রদায়িক, চরমপন্থী, মৌলবাদী, ফান্ডামেন্টালিস্ট প্রভৃতি বলে কটাক্ষ করা হবে। এ পর্যুদস্ত মানসিকতা আরও স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে কতিপয় মুসলিমের পোশাক-পরিচ্ছদে। তারা যখন কোনো অমুসলিম রাষ্ট্র সফর করে তখন তারা ইসলামের পোশাক পরিত্যাগ করে বিজাতীয় বেশ-ভূষা অবলম্বন করে। এরা বিজাতিদের সবকিছু অবলীলায় গ্রহণ করতে যেন আনন্দবোধ করে। পশ্চিমাদের মন জয় করতে এরা সর্বক্ষেত্রে তাদের রীতি-নীতি গ্রহণ করে নব্য ইউরোপিয়ান সাজতে চায়। ইসলাম

অনুমোদিত পোশাক-পরিচ্ছেদ ও তাহযীব-তমদ্দুনের প্রতি এদের কোনো আকর্ষণ নেই। এজন্য এরা নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি মোতাবেক জীবন-যাপন করাকে অপমানকর মনে করে। এটা তাদের দুর্বল মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।

পক্ষান্তরে যারা উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলিম নয়, বরং অন্য ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, নতুন ধর্ম ও তার হুকুম-আহকাম পালনে তাদের নিষ্ঠা এবং ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের প্রতি আকর্ষণ রীতিমতো বিস্ময়কর।

একজন ইংরেজ নব মুসলিমের ঘটনা শুনুন, যিনি নিজেকে মুসলিম পরিচয় প্রকাশে মোটেও কুণ্ঠিত হননি, বরং মুসলিম পরিচয় প্রকাশ করাকে তিনি গর্বের বিষয় মনে করেছিলেন।

তিনি ইসলাম গ্রহণের তিন সাপ্তাহ পর অন্য এক শহরে চাকুরির সন্ধান পেয়ে সেখানে যাওয়ার জন্য মনস্থ করলেন। এদিকে স্থানীয় একটি ইসলামী যুবকল্যাণ সংস্থা লোকজন তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে পরামর্শ দিতে চেয়েছিল যে, তিনি যেন ইন্টারভিউ কালে ইসলাম গ্রহণের কথা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ না করেন, যাতে বিষয়টি চাকুরিতে অমনোনীত হওয়ার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। কারণ তারা আশঙ্কা করছিল যে, ইসলাম গ্রহণের কারণে চাকুরিতে অমনোনীত হলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নতুন ধর্ম ত্যাগ করতে পারেন। কিন্তু তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। ততক্ষণে তিনি ইন্টারভিউ দিতে চলে গেছেন। সেখানে তিনি আরও অনেক অমুসলিম লোকের দেখা পেলেন, যারা একই পদে চাকুরি প্রার্থী। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন তার ইন্টারভিউ শুরু হলো, তিনি কর্মকর্তাদের বলে দিলেন আমি স্বধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছি, পূর্বে আমার নাম ছিল রোড, আর বর্তমান নাম হলো উমার। তিনি আরও বলেন, আমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করেছি, সেহেতু আমাকে এই পদের জন্য মনোনীত করা হলে অবশ্যই সালাতের সময় দিতে হবে।

উক্ত নব মুসলিম যুবকের মুসলিম পরিচয় প্রকাশ চাকুরির পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি, বরং তা চাকুরির জন্য সহায়ক হয়েছে। কারণ কর্মকর্তারা তাকে তৎক্ষণাৎ উক্ত পদের জন্য মনোনীত করেন। সবচেয়ে

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কর্মকর্তারা এই যুবকের ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদে কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়নি, উপরন্ত তার এ সিদ্ধান্তের প্রশংসা করে বলল, আমরা এই পদের জন্য এমনই একজন ব্যক্তির সন্ধান করছিলাম, যিনি সকল প্রতিকুলতা ডিঙিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসাধারণ ক্ষমতা রাখেন। আর আপনার মাঝে আমাদের প্রত্যাশিত গুণটি পাওয়া গেল। কারণ আপনি চরম বৈরী পরিবেশে থেকেও স্বধর্ম ত্যাগ ও নাম পরিবর্তনের মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন, আপনাকে ধন্যবাদ। এই নব মুসলিম তার পরিচয় প্রকাশ করেছেন স্বগর্বে। যেকোনো প্রতিকূল পরিবেশে নিঃসংকোচে স্বীকার করেঃ আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, আর এটা আমার ইসলামী পোশাক, সুতরাং তা পরিধান করতে আপত্তি কিসের?

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে, তারা যেকোনো স্থানে ইসলামী পোশাক পরিধান করে থাকেন এবং এসব পোশাক পরিধান করতে গর্ববোধ করেন। ধর্মীয় বিধানের প্রতি তাদের এই আগ্রহবোধ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তারা পুরোপুরি দীন মেনে চলতে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরো দীন বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য বিস্ময়কর কাহিনী থেকে একটি কাহিনী বর্ণনা করব, যা আমাদের অন্তঃচক্ষু খুলে দিবে।

ঘটনাটি ঘটেছিল পারস্যের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ চলাকালে। এ যুদ্ধে পারস্যের সেনাপতি ছিল রুস্তম, আর মুসলিমদের সেনাপতি ছিলেন সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু। মুসলিম বাহিনী যখন পারস্য সীমান্তের নিকটবর্তী হলো, তখন রুস্তম দূত মারফত মুসলিমদের আগমনের কারণ জানতে চাইল। জবাবে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করলেন। এ দলের প্রধান ছিলেন রিবয়ী ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু। প্রতিনিধি দল রুস্তমের সভাকক্ষে পৌঁছলে রুস্তম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী?

রিবয়ী ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে

আল্লাহর গোলামীর পথ দেখাতে এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে তার প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যেতে।

এ কথা শুনে রুস্তমের মনোজগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি হলো। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, কি দুর্ভাগ্য আমার! এই বিশাল সেনাবাহিনী যাতে কেবল গায়িকা আর বাবুর্চি রয়েছে হাজার হাজার, অথচ এ লোকের (রিবয়ী ইবনে আমেরের) মতো দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন একজন লোক নেই।

রিবয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু এসেছেন একটি অখ্যাত দ্বীপ থেকে, যাদেরকে বলা হয় মরুবাসী বেদুঈন। রুস্তমের সম্পদের জৌলুস ও নাগরিক সভ্যতার তুলনায় যাদের কোনো সভ্যতাই নেই। এতদসত্ত্বেও রিবয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু রুস্তমকে বলছেন, পার্থিব জীবনের সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা। তাঁর কথাগুলো রুস্তমের কাছে দুর্বোধ্যই মনে হলো। এজন্য তার ললাটে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা।

রিবয়ী ইবনে আমের রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু আরও বললেন, আমরা এসেছি ধর্ম নামের অধর্মগুলোর বর্বরতা হতে মানবজাতিকে মুক্ত করে ইনসাফপূর্ণ ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীন সহকারে বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেছেন যেন আমরা তাদেরকে দীনের পথে আহ্বান করি। যারা এই দীন গ্রহণ করবে, আমরা তাদেরকে সাদরে বরণ করে নেব এবং কোনো রূপ সংঘর্ষ ছাড়াই দেশে ফিরে যাব। আর যারা এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে, আমরা তাদের সাথে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অর্জন করে ধন্য হব।

রুস্তম বলল: তোমাদের আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কী?

রিবয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন: যারা যুদ্ধে মৃত্যুর সুধা পান করবে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুখের চিরন্তন আবাস জান্নাত। আর যারা বেঁচে থাকবে তাদের রয়েছে অনিবার্য সফলতা ও গৌরবময় বিজয়।

পরিকল্পিত আক্রমণে মিডিয়ার প্রভাব

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ মিডিয়া অপব্যবহারের সুদূর প্রসারি ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলামের শত্রুরা মুসলিম জাতির আমল-আকীদা সমূলে ধ্বংস করার জন্য মিডিয়াকে প্রধান মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এক দিকে এমন কোনো শক্তিশালী সংবাদ প্রচার হতে দিবে না, যার মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বাণীটি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যায়।

অপর দিকে মার্কিন ইহুদী প্রভাবিত প্রচার মাধ্যমগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস ও মৌলবাদের অপবাদ প্রচার করে যাচ্ছে, যাতে করে বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত না হয়। তারা অনবরত প্রচার করে যাচ্ছে ইসলামকে বর্বর ও জঙ্গিবাদী ধর্ম হিসেবে। ইসলামের অনুসারীদেরকে পরিকল্পিতভাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে মানবতার শত্রু রূপে। আর আল্লাহ বলেন,

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

“তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পরিপূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।” [সূরা আস-সাফ: ৮]

বর্তমান বিশ্ববাসী শান্তি খোঁজাখুঁজি করছে। যারা বুঝেছে শান্তির ছায়া একমাত্র ইসলামেই তারা এখন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান দানকারী ব্যক্তিকে তালাশ করছে। ইসলামকে জানতে তারা হা করে তাকিয়ে আছে। প্রয়োজন শুধু মুসলিমদের সাহসিকতা, বাস্তব ভূমিকা ও আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

পশ্চিমাদের উত্থাপিত অভিযোগের মাধ্যমে আক্রমণ

যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে যাতায়াত করে, তারা যখন ভিন্নধর্মের লোকদের মুখোমুখী হয়, তখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয় এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানের হেকমত ও যুক্তি নিয়ে আলোচনা করাকে প্রাধান্য দেয়। তাদের ধারণা হলো, এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গিকে নিমিষেই দূর করে দেয়া যাবে। অথচ তাদের এ ধারণা ভুল। কারণ পশ্চিমারা কথায় নয়, তারা কাজে বিশ্বাসী। তাদের অভিযোগ যতই খণ্ডন করা হোক না কেন, তাদেরকে কখনোই সন্তুষ্ট করা যাবে না। তাদের অভিযোগের একমাত্র জবাব হলো, শরীয়ত অনুযায়ী আমল ও তার সফল বাস্তবায়ন। কারণ পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার ফলে আমাদের সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা যখন তারা অবলোকন করবে এবং ইসলামের সৌন্দর্য, সত্যতা ও সার্বজনীনতা বুঝতে সক্ষম হবে, তখন তারা নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদের কুফল প্রত্যক্ষ করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে।

সাইয়েদ কুতুবের ভূমিকাটি অত্যন্ত সুন্দর। তার দৃষ্টান্ত এমন যে, ধরুন- কোনো ব্যক্তি আপনার প্রতি অস্ত্র তাক করে আছে, তখন আপনার প্রথম কর্তব্য হবে তাকে নিরস্ত্র করা। অতঃপর আলোচনার মাধ্যমে আপনার যুক্তি-দর্শন তার সামনে তুলে ধরা। কাজেই পশ্চিমাদের নীরব করার উত্তম পন্থা হলো, উত্থাপিত অভিযোগের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পাল্টা তাদের ধর্ম ও জীবনাচারের ওপর অভিযোগ করা। এতে তারা আমাদের ধর্মের ওপর অভিযোগ উত্থাপন করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। কেননা তাদের যে ধর্মবিশ্বাস ও জীবনাচার তা মোটেও যুক্তিগ্রাহ্য নয়, বরং তা একেবারেই কল্পনা প্রসূত।

জার্মানির এক টিভি লাইভ শোতে একজন জার্মান মুসলিম স্কলারকে উপস্থাপক প্রশ্ন করেছিলেন, মুসলিমরা কেন সন্ত্রাস করে? তিনি তখন উক্ত প্রশ্নের জবাব এমনভাবে উল্টো প্রশ্ন করে দেন:

যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল তারা কি মুসলিম? প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হতাহত হয়েছিল প্রায় ৪০ কোটি। ১৯ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল।

যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করেছিল তারা কি মুসলিম? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৮ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল।

যারা অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য ২০ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীকে হত্যা করেছিল, তারা কি মুসলিম?

যারা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করেছিল তারা কি মুসলিম? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানে কয়েক লক্ষ নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বেসামরিক মানুষকে জীবন্ত দগ্ধ করে মেরেছে এসব তাদের কর্মকাণ্ড।

যারা আমেরিকা আবিষ্কারের পর নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্য উত্তর আমেরিকা বর্তমান যুক্তরাষ্ট্র ১০০ মিলিয়ন এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে ৫০ মিলিয়ন ইন্ডিয়ানকে হত্যা করেছিল তারা কি মুসলিম ছিল?

যারা ১৮০ মিলিয়ন আফ্রিকান কালো মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে আমেরিকা নিয়ে গিয়েছিল। যাদের ৮৮ ভাগ সমুদ্রেই মারা গিয়েছিল এবং তাদের মৃতদেহকে আটলান্টিক মহাসাগরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তারা কি মুসলিম?

উত্তর হবে এসব মহা সন্ত্রাসী ও অমানবিক কার্যকলাপের সাথে মুসলিমরা কখনোই জড়িত ছিল না।

ইরাক ও আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে তেল, গ্যাস লুণ্ঠন কি মুসলিমরা করেছিল? সেখানে হাজার হাজার টন বোমা বর্ষণ করে নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে কারা?

আপনাকে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা সঠিকভাবে করতে হবে। যখন কোনো অমুসলিম কোনো খারাপ করে, খুন-খারাবি করে তখন এটাকে বলা হয় আত্মরক্ষার্থে। আর যখন মুসলিম আত্মরক্ষার্থে কিছু করে তখন এটাকে বলা হয় জঙ্গিবাদ।

ইসরাঈলের ইহুদীরা অত্যাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ফিলিস্তিনের নিরীহ নারী পুরুষদের ওপর হামলা করলে হয় আত্মরক্ষা এবং ফিলিস্তিনের জনগণ উহ আহ শব্দ করলে হয় মৌলবাদ বা জঙ্গি। বর্তমান সন্ত্রাস বিষয়টি একটি বিশ্ব সমস্যায় রূপ নিয়েছে, পুরো পৃথিবীকে নষ্ট করে দিয়েছে। অন্যায়ভাবে কোটি কোটি মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে একথা বলছি যে, একমাত্র ইসলাম ছাড়া এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.

"নরহত্যা বা যমীনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেউ কারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।" [সূরা আল-মায়েদা: ৩২]

কুরআনের অনেক আয়াত রয়েছে যা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক করেছে।

পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি থেকে নিষেধ করেছেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর ইসলামও সন্ত্রাস দমন করে নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। বিশ্ব নিরাপত্তা এখন সকলের দায়িত্ব। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এখন এমন আশ্রয়স্থান ও এমন তাঁবুতে বসবাস করছে যা চতুষ্পদ জন্তু বসবাসের উপযোগী নয়।

মুসলিমদের শত্রুরা এখন মুসলিমদের নাম ও চিহ্ন ব্যবহার করে সন্ত্রাস করছে, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করছে, নিজেরা (ইউরোপ আমেরিকা) নিজেদের দেশের জনগণের কাছে সাধু সেজে মুসলিমদের ওপরে তথাকথিত জঙ্গি সন্ত্রাস দমনের নামে মুসলিমদের তেল-গ্যাস, ভূমি লুটপাট করছে। আল-কায়েদা, বোকোহারাম, ইসলামী স্টেট বা আইএস শুনতে ইসলামী নাম হলেও এগুলোর কার্যক্রম থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এগুলো ইউরোপ-আমেরিকার তৈরি, ঐসব কপাল পোড়া সংগঠনের সাথে ইসলাম ও মুসলিমদের ন্যূনতম সম্পর্ক নেই ইনশাআল্লাহ।

"ইসলামী জঙ্গি" নামে কেউ সন্ত্রাস করলে বুঝতে হবে এসব ইসরাঈলি আমেরিকার ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা।

একটা কথা আছে আলেমগণ ধর্ষক হয় না, ধর্ষক আলেম সাজে, নামাযি জুতা চুরি করে না বরং চোর নামাযি সাজে, মুসলিম সন্ত্রাসী হয় না বরং সন্ত্রাসী মুসলিম সাজে।

ইসলামের শত্রুরা ইসলামের সৌন্দর্য ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করে তার অনুসারীদের মাঝে সন্দেহ ঢুকিয়ে তার থেকে দূরে সরাতে চায়। তারা অভিযোগ করে যে, ইসলামে একাধিক বিবাহের অনুমতি এটি ঠিক না। আমরা মুসলিম দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে পারি যে, বাস্তবে এ বিষয়টি মহান করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীয় বান্দাদের প্রতি দয়া। কারণ এমন অবস্থা যদি হয় যে, স্বীয় স্ত্রী বন্ধ্যা যার ছেলে-মেয়ে হবে না অথবা চিররোগী অথবা তার সাথে সুন্দরভাবে মেলামেশা করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় অবৈধ-পন্থা অবলম্বন না করে একাধিক বিবাহের অনুমতি নিঃসন্দেহে তার জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া।

তারপরও ইসলাম এ ব্যাপারে শক্ত শর্ত আরোপ করেছে তা হলো স্ত্রীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে আদল ও ইনসাফ বাস্তবায়ন করা। আর যদি তা না পারে তাহলে একটাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

অতএব, যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তাদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারবে না, তবে একজনকেই গ্রহণ কর। [সূরা আন-নিসা: ৩]

মৌলবাদ (Fundamentalism)

খ্রিস্টানদের বিকৃত ধর্ম টেকানোর উপায়স্বরূপ মৌলবাদের উদ্ভব ঘটেছে। মৌলবাদের উৎপত্তি ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এই মৌলবাদ খ্রিস্টান ধর্মমতবাদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও দর্শনের সমঝোতার বিরোধী। আর ইসলাম বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম এবং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের ধর্ম।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মিশনারি তৎপরতা

ইহুদী ও খ্রিস্টান মিশনারির তৎপরতা ও কার্যক্রমের ব্যাপারে সাবধানতা একান্ত জরুরী। তারা সারা দুনিয়াতে মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করে। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক বিশৃঙ্খলা ঘটানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করেছে। দরিদ্রতা বিমোচনের নামে আর্থিক সহযোগিতা, চিকিৎসা সেবার নামে হাসপাতাল এবং নারীদের ক্ষমতায়ন এর নামে N.G.O স্থাপন করেছে। এসব কিছুর পিছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদেরকে ধর্মান্তর করা। আর যদি করতে সক্ষম না হয় তবে কমপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে মুসলিমদের অন্তরে সন্দেহের বীজ বপন করা। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্ম মিথ্যা ভিত্তিহীন ও বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও কেন তারা এ ব্যাপারে কিছুটা হলেও সফলতা অর্জন করছে। কারণ তাদের নাকি কোনো পাপ নেই। যিনা কর, অন্যায় কর, মানুষ হত্যা কর, হারাম উপভোগ কর, সকল পাপের দায়ভার নাকি ঈসা ‘আলাইহিস সালাম শূলে চড়ার মাধ্যমে নিয়ে গেছেন। তাদের কথায় এই ঈসায়ী ধর্মই হচ্ছে গুনাহ থেকে মুক্তির একমাত্র সহজ পথ, নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

“প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। আর কেউ কারো কোন বোঝা বহন করবে না।” [সূরা আল-আন‘আম: ১৬৪]

যখন মুসলিমদেরও বিশ্বাস বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তারা বাস্তবিকভাবেই প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হবে এবং তাদের জীবনে এক ক্রিয়াশীল নব অধ্যায়ের সূচনা হবে।

পক্ষান্তরে যে মুসলিম প্রকৃত অর্থেই সঠিক আকিদা পোষণ করে, সে সর্বদা স্থিতিশীল জীবন-যাপন করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রসহ জীবনের সর্বস্তরে ইসলামী আদর্শ মেনে চলে। কোনো পর্যায়েই সে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় না।

জীবিকা নির্বাহ ও রিযিক জোগাড় বিষয়টি মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বহু মুসলিম এমন রয়েছেন, যারা ইসলামী বিধি-বিধান অহরহ লঙ্ঘন করে চলছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জীবের জীবিকার ব্যবস্থা করেন, তিনি সকলের রিযিকদাতা-রাজ্জাক, তারা কখনও রিযিক জোগাড় করতে গিয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয় না। তাদের পক্ষে তা কখনো সম্ভবপরও নয়।

লন্ডনে এক আলজেরীয় মুসলিম যুবক বলল:

একদিন আমি কাজের সন্ধানে এক হোটেলে গেলাম। হোটেল মালিক যথারীতি আমার প্রাইভেট ইন্টারভিউ নিল। কিন্তু তার কোনো ফলাফল আমাকে জানালো না, বরং বলল: এ বিষয়ে আমাদের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে, সেখানেই ফলাফল জানানো হবে। তোমার বিষয়টিও আমরা ভেবে দেখব!

অতঃপর সে আমাকে মদ্যপানের আমন্ত্রণ জানালো। হোটেল মালিকের এমন আমন্ত্রণে আমি বিপাকে পড়ে গেলাম। মুসলিম হিসেবে তার এ আহ্বানে সারা দেয়া আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। কিন্তু এ মুহূর্তে সাড়া না দিলে যে রিযিক এর সম্ভাব্য পথটিও বন্ধ হওয়ার উপক্রম! এজন্য আমি সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেলাম। পরক্ষণেই এ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, মালিক আমাকে চাকুরির জন্য গ্রহণ করুক আর নাই করুক, আমি তার এর আমন্ত্রণে কিছুতেই সাড়া দেব না এবং মদও পান করব না। তাই বললাম: জনাব! আমি মুসলিম, আমাদের ধর্মে মদ্যপান হারাম। এজন্য আপনার আমন্ত্রণে সাড়া দিতে পারলাম না।

একথা শুনে হোটেল মালিক বিস্মিত হয়ে বলল তাই নাকি! আমি বললাম: হ্যাঁ, তা-ই!

মালিক বলল: তাহলে আর বিলম্ব নয়। তুমি এখন থেকেই চাকুরির জন্য নির্বাচিত।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম: তা কীভাবে?

মালিক বলল: এখানে হোটেল কর্মচারীদের নিয়ে ভীষণ সমস্যা। এরা রাতভর মদের নেশায় মত্ত হয়ে আমোদ-ফুর্তিতে কাটায়। তারপর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। এজন্য প্রত্যহ আসতে তাদের দেরি হয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ও মতবাদ তৈরি

সেকুলারিজম (Secularism)

Secular অর্থ আর্থিক আর ism হচ্ছে মতবাদ এর অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয়। আরবিতে বলা হয় لا دينية বা ধর্মহীনতা বা ধর্মের শানে সম্পর্কহীন। ধর্মকে বাদ দিয়ে বস্তুবাদী স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় এই সেকুলারিজমে। আসলে জনগণকে ধোকা দেয়ার এটি একটি ফ্যাসিবাদী অপকৌশল।

ধর্মহীনতা ব্যবহার না করে ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যবহার কোন কোন দিক দিয়ে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক: ইসলামে সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ আর সেকুলারিজমে সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মানুষের তৈরি মতবাদ।

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন সবাই ধর্মের পক্ষে ছিলেন, কেউ ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্ম পালনে ইসলাম তাদেরকে অধিকার ও স্বাধীনতা দিয়েছে।

ইসলামে ব্যভিচার সর্বাবস্থায় হারাম, কিন্তু সেকুলারিজমে উভয়ের সম্মতিতে তা হালাল করা হয়েছে। ইসলামে প্রয়োজনে চারটা পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ আর সেকুলারিজমে একটির অধিক বিয়ে করা বৈধ না।

ইসলামে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েকে পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হালাল। সেকুলারিজমের ১৮ বছর এবং ছেলের ২১ বছরের পূর্বে পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে বিবাহ হলেও অবৈধ বা দণ্ডনীয় অপরাধ।

ইসলামে সুদ হারাম আর তাদের কাছে সুদ হালাল। ইসলামে মদ হারাম আর তাদের কাছে মদ হালাল।

তারা রাষ্ট্র ও সামাজিক জীবন থেকে ধর্মকে আলাদা করেছে। তাদের কথা: ধর্ম থাকবে অন্তরে ও মসজিদে, ধর্মের প্রভাব মুক্ত হবে রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাষ্ট্রক্ষমতা থাকবে রাজার হাতে আর মসজিদের ক্ষমতা আল্লাহর। এ ছাড়াও স্নায়ুযুদ্ধের কবলে পড়ে ইউরোপ থেকে ধর্মহীন

আইন-কানুন আমদানি করে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ও চরিত্র ধ্বংস করা হচ্ছে। পারিবারিক ভিত ভেঙে দেয়া হচ্ছে। মুসলিমদের আকীদার মাঝে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হচ্ছে।

তবে ভালো করে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে, ইসলামের অকাট্য বিধান ভঙ্গ করে কোনো অবস্থায়ই কোনো আইন মানা যাবে না। তাহলে আসুন জেনে নিই আল্লাহ এ ব্যাপারে কী বলেছেন? আল্লাহ বলেন,

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ.

“তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে ঈমান আন এবং কিছু অংশে কুফরী কর? তাহলে তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ও অপমান এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে।” [সূরা আল-বাকারা: ৮৫]

জাতীয়তা

জাতীয়তা হচ্ছে কোনো ভূখণ্ডের মানুষ যখন অধিকতর গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য জনগণ থেকে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করে তখন জাতীয়তার উদ্ভব ঘটে।

তবে মুসলিমদের কোনো দেশভিত্তিক জাতীয়তা নেই। তাই আসুন দেখা যাক ইসলামী জাতীয়তা ও পাশ্চাত্য জাতীয়তার মধ্যে পার্থক্য।

ইসলামী জাতীয়তার ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও ওহী ভিত্তিক, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতীয়তা বস্তুবাদী নির্ভর।

ইসলামী জাতীয়তা কোনো ভূখণ্ডের সাথে সীমাবদ্ধ নয়, আর পাশ্চাত্য জাতীয়তা কৃত্রিম ভূখণ্ডগত সীমাবদ্ধ রেখা তৈরি করে।

ইসলামী জাতীয়তায় সাদা-কালোতে কোনো ভেদাভেদ নেই। পাশ্চাত্যে জাতীয়তার অনুসারীদের মধ্যে এ ভেদাভেদ রয়েছে।

ইসলামী জাতীয়তা মানুষে মানুষে সাম্য মানবতা সর্বজনীন শিক্ষা দেয় আর পাশ্চাত্য জাতীয়তার অনুসারীরা মুখে মুখে তা রেখেছে, বাস্তবে তার উল্টা।

ইসলামী জাতীয়তা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি করে, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতীয়তা মানুষের মধ্যকার ঐক্যসূত্রকে বিনষ্ট করে, বিশেষ করে বিনষ্ট করে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের ধারণাটি বিজাতীয়।

সব ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও সমস্ত সীমান্ত প্রাচীর ভেঙ্গে এক মুসলিম উম্মাহ বা মুসলিম জাতি ও তার চেতনা ও ধারণাকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবরূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চলছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

পুঁজিবাদ (Capitalism)

পুঁজিবাদ (اَلرَّأْسُمَالِيَةُ) বা ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের বিপরীত অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝানো হয় যেখানে বাজার অর্থনীতিতে মুনাফা তৈরির লক্ষ্যে বাণিজ্য কারখানা এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে।

বৈশিষ্ট্য:

- পুঁজি সঞ্চয়ন (ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে)।
- প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের উদ্ভব ঘটে।
- শ্রমিকের মজুরি (কম মজুরি প্রধান হয়) যার ফলে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত সৃষ্টি হয়।
- ব্যক্তিগত ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত হয়।
- সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে থাকে।

বিশ্বের বর্তমান অশান্তির ও অস্থিরতার মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের সুচতুর কৌশল। এখানে আদর্শের কোনো স্থান নেই।

সমাজতন্ত্র (Socialism)

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বাধীনতা থাকে না এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিকানা ব্যক্তির পরিবর্তে সমগ্র সমাজের নিকট হস্তান্তরিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা বলে।

তাই বলা হয় উৎপাদনের উপাদানসমূহের মালিক রাষ্ট্র অর্থাৎ কিছু লোকের অধীনে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

"যাতে তোমাদের মধ্যে যারা ধনী শুধু তাদের মধ্যে ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।" [সূরা আল-হাশর: ৭]

এই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভোক্তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হরণ করা হয়। রাজনীতির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির ফলে অনেক সময় রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

আর ইসলামী অর্থনীতি যেকোনো বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দেয়া।

বিশ্বায়ন (Globalization)

বিশ্বায়ন হলো প্রাচ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংস্করণ। যার নেতৃত্বে আমেরিকা ও ইয়াহুদী লবির হাতে। বিশ্বায়ন হলো এমন এক আন্দোলন, যার লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, জাতীয় ও দেশভিত্তিক স্বাতন্ত্র ধ্বংস করে গোটা পৃথিবীকে ইয়াহুদী লক্ষ্য ও মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে নতুন পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসা।

মুসলিম বিশ্বই কেন বিশ্বায়নের আসল লক্ষ্য? যদিও সমগ্র পৃথিবীর উপরে বিশ্বায়ন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু এর আসল লক্ষ্য হলো মুসলিম ও মুসলিম বিশ্ব। এর নেপথ্যে চারটি কারণ রয়েছে:

১. পুরো পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্রগুলো ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত।

২. মুসলিম বিশ্ব বিস্ময়কর খনিজ সম্পদে টইটুম্বুর হয়ে আছে।

৩. পৃথিবীর তিনটি বৃহৎ ধর্ম ইসলাম, খৃষ্টবাদ ও ইহুদী ধর্মের পুণ্যভূমিগুলো মুসলিম বিশ্বে অবস্থিত।

৪. বিশ্বায়ন মোকাবেলা করার ক্ষমতা একমাত্র ইসলামেই রয়েছে। তাই তারা বিশ্বাস করে যে, বিশ্বায়নের পথে হুমকি হওয়ার ক্ষমতা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের নেই।

স্নায়ুযুদ্ধের আক্রমণের অংশ হিসেবে হাদিস অস্বীকার করা, হাদীস জালকরণ এবং বিভিন্ন যুগে এর আক্রমণের ধরণ

এ বিষয়ে ড. মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম লেকচার শীটে সুন্দর করে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে সেখান থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছিঃ

সকল নবী-রাসূলের নিকটই আল্লাহর পক্ষ থেকে সঠিক দিক-নির্দেশনা এসেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী জীবনের সকল কথা, কাজ, সম্মতি হলো হাদিস। ইসলাম বিদ্বেষীরা এই জায়গাতে টার্গেট করে মানুষদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, হাদিস মুখস্তকরণে, লিখনে, বলনে এবং সংরক্ষণে কোনো না কোনো পর্যায়ে সমস্যা থেকে যেতে পারে। হাদিসে ভুল থেকে যাওয়া, অনেক অংশ বাদ পড়ে যাওয়া, অতিরিক্ত কিছু ঢুকে যাওয়া, জাল হওয়া এই সবকিছুই তো স্বাভাবিক। এটিকে পুঁজি করে সুন্নাহ অস্বীকার করেও জাল হাদিস রচনা করে ও ইসলামের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ চালানো হয়েছে। যেমন- ‘আমার উম্মতের মতবিরোধ হচ্ছে রহমত’। এটি একটি কুরআনের পরিপন্থী জাল হাদিস। যদি ‘বিরোধ’ রহমত হয় তাহলে ‘ঐক্য’ হবে রহমত পরিপন্থী যা আল্লাহ বিরোধী কথা।

হাদীস অস্বীকারকারী ফেরকা

হাদীস অস্বীকারকারীগণ দাবি করেন তারা ”আহলুল কুরআন” মূলত কেউ হাদীস অস্বীকার করলে তার আল-কুরআনও অস্বীকার করা হয়। কিছুদিন পূর্বে থেকে তারা একটি নতুন দলের আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা নিজেদেরকে দাবী করে আহলুল কুরআন (হাদীস অস্বীকারকারী)

আসলে এরা ইয়াহুদীদের স্নায়ুযুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে মুসলিমদের আকীদার মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করার অপচেষ্ট করছে। তারা ইয়াহুদীদের বাণীগুলো পূনরাবৃত্তি করে কুরআনকে অস্বীকার করছে। আল-কুরআনে শত শত আয়াত রয়েছে যাতে আল্লাহ তাআলা তার রাসূল'কে অনুসরণ অনুকরণ ও আনুগত্য করার জন্য বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কেউ রাসূলের আনুগত্য করলে সে তো আল্লাহর আনুগত করলো। (সুরা: নিসা আয়াত ৮০)

এর পরও কিভাবে তারা হাদীস অস্বীকার করে আল-কুরআন মানার দাবী করতে পারে?।

খোলাফায়ে রাশেদার যুগ

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগ :

১. নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবী করে: ইসলাম ত্যাগ করে কিছু স্বার্থবাদী লোক মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবী করে। এদের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও একজন মহিলা নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবী করেছিল। তারা হলো: মুসায়লামাতুল কায্যাব, তালহা বিন খুওয়াইলিদ, আসওয়াদ আল আনাসী এবং সাজাহ্ বিনে আল হারেয (মহিলা)।

২. কেন্দ্রীয় সরকারের যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে : ইসলামের একটি বিধান যাকাতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইসলামকে অস্বীকার করা। তাই আবু বকর (রা) নিজেই মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানের নেতৃত্ব দেন।

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর যুগ :

উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুর ১০ বছরের অধ্যায় ইসলামের ইতিহাসে এক সোনালী অধ্যায়। এ সময় ইসলাম, মুসলিম ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ হয়নি। এর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু। সে সময় তিনি সবকিছু শক্ত হাতে দমন করেছেন। তাঁর কারণেই স্নায়ুযুদ্ধের অংশ হিসবে গোপনে তাকে হত্যা করা হয়।

উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগ :

আব্দুল্লাহ বিন সাবা ছিল একজন ইহুদী। স্নায়ুযুদ্ধের অংশ হিসেবে সে তার কিছু অনুসারী নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর সে তার অনুসারীদেরকে উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর বিরোধিতা করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় পাঠায়। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর যুগ :

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর দলের মধ্য থেকে এক দল বের হয়ে তারা খারেজি নামে আত্মপ্রকাশ করে। তারা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এরা ইসলামের ব্যাপক ক্ষতিসাধনে আত্মনিয়োগ করে। এভাবেই চলছিল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে ইহুদী-খ্রিস্টান চক্রের কুচক্রী ষড়যন্ত্র।

উমাইয়া যুগ :

মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর ইন্তেকালের পর হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কারবালা প্রান্তরে এনে শহীদ করা হয়।

আব্বাসীয় যুগ :

আব্বাসীয় শাসনামলে ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক নানা মনগড়া বক্তব্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। খলিফা মামুন বায়তুল হিকমা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তক গ্রিকভাষা থেকে অনুবাদ করিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচার শুরু করে দেয়। যার ফলে মুসলিম জ্ঞানীদের একটি বিশাল অংশ গ্রিকদর্শনের শিকার হয়ে পথচ্যুত হয়ে পড়ে। সেখান থেকেই জন্ম নেয় মু‘তাযিলা ফিরকা এবং নানা বিভক্তি।

ফাতেমীয় যুগ :

জাফর সাদিক আলী ও ফাতেমীর বংশের ষষ্ঠ ইমাম। এ সময়ে শিয়া উত্তরসূরীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার চালান। ইসলামের মনগড়া উপস্থাপন, কুরআনের নিজের মত করে ব্যাখ্যা প্রদান, হাদিস জালকরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ, তথাকথিত সুফিবাদের প্রচার-প্রসারসহ নানাভাবে এ যুগে বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ হয়।

বিভিন্ন যুগের ভ্রান্ত আক্বীদাগত মতবাদ

১. শিয়া মতবাদ :

শিয়া আরবি শব্দ, যার অর্থ সম্প্রদায়। উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর নম্র শাসনের সুযোগ পেয়ে মুসলিমদের দলে অনেক অমুসলিম এবং নামে মাত্র মুসলিম হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তাদের লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের দলে সম্পৃক্ত হয়ে তাদেরকে আরও বেশি বিভেদের পথে ঠেলে দেয়া। তারা মুসলিম জাহানে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। ইবনে সাবাহ ছিল এমন একজন লোক যে ছিল মূলত ইয়াহুদী।

শিয়াদের বিভিন্ন উপদল রয়েছে। তাদের মধ্যে ইসমাঈলিয়া শিয়ারা মনে করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী নন। বরং শিয়াদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ইমাম ইসমাঈল হলেন শেষ নবী, নাউজুবিল্লাহ।

তারা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ এর শেষে عَلِيٌّ خَلِيفَةُ اللهِ বলে। যার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং আলী হলেন আল্লাহর খলিফা।

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর নির্বাচিত তিন খলিফাকে অবৈধ মনে করে। তারা মনে করে, আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদের চেয়ে অধিক যোগ্য। কেননা তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামাতা। শিয়ারা কুরআনকে চিরন্তন গ্রন্থ হিসেবে বিশ্বাস করে না এবং অর্থের বিনিময়ে সাময়িক সময়ের জন্য চুক্তিভিত্তিক বিবাহ বৈধ মনে করে যা ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাদের কেউ কেউ এমন ধারণা করে যে, মূলত রিসালাত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে নিয়ে আসার কথা ছিল, কিন্তু জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম ভুল করে তা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে এসেছেন।

২. খারেজী মতবাদ :

তারা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করতঃ ব্যভিচারীকে রজম তথা পাথর নিক্ষেপ করার বিধান অস্বীকার করে।

তাদের মতে কোনো কোনো নবীকে কবীরা গুনাহের কারণে কাফের বলা যায় যতক্ষণ না তিনি তাওবা করেন।

তারা মনে করে সাহাবীগণ কবীরা গুনাহ ও কুফরী করেছেন। তারা উমার, উসমান ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমের হত্যাকারীদের প্রশংসা করে। তারা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে কাফের ও মুরতাদ মনে করে।

খারেজীদের মতে, মানুষ হয় মুমিন; নয় কাফের। একই ব্যক্তির কাছে পাপ ও পুণ্য একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। কবীরা গুনাহকারী কাফের। কোনো মুসলিম কবীরা গুনাহ করলে তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে সে কুফরীতে প্রবেশ করে। সে তাওবা না করে মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। তারা মনে করে, যারা তাওবা করে না তাদের হত্যা করা বৈধ।

৩. মু'তাযিলা মতবাদ :

আব্বাসীয় খলিফা মামুনের যুগে মু'তাযিলা মতবাদের উত্থান হয়। খলিফা মামুন (২১২ হি.) খালকে কুরআনের (কুরআন আল্লাহর সৃষ্টি) আকিদা-বিশ্বাসের প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন এবং মু'তাযিলী আলিমদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সরকারিভাবে তাদের সার্বিক সহযোগিতা করেন।

৪. আশ'আরী মতবাদ :

তারা মু'তাযিলাদের পুরো উল্টো মতবাদে বিশ্বাসী। আবুল হাসান আল-আশ'আরীর নামানুসারে এ দলের নামকরণ করা হয় আশ'আরী। তিনি ছিলেন মু'তাজিলা পণ্ডিত আল-যুব্বাইর ছাত্র। তিনি মনে করেন, ধর্ম শুধুমাত্র যুক্তি নির্ভর নয়; যুক্তির সাথে দর্শন ও কালাম যুক্ত।

৫. মুরজিয়া মতবাদ :

মুরজিয়া অর্থ অবকাশ দেয়া, বিলম্বিত করা, পশ্চাৎবর্তী করা। ঈমান থাকলে যেমন কোনো গুনাহ দ্বারা ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না, অনুরূপ

কুফরী করলে কোনো ইবাদতই কাজে আসবে না। এভাবে তারা পাপাচারের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। এ মতের উদ্ভাবক হলো হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবি তালিব।

মুরজিয়াদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ :

মুরজিয়ারা মানুষকে ঈমান ও ইসলামের প্রতি অবিচল অটল না থাকার জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছে। যেমন- পরকালে মুক্তির জন্য ব্যক্তি মানুষ যথেষ্ট। ইবাদতের দ্বারা কোনো উপকার আসবে না; আবার পাপ করলে কোনো ক্ষতি হবে না।

৬. বাহাইবাদ/বাহাই মতবাদ :

এরা কৌশলে প্রচার করে যে, পৃথিবীর সকল ধর্ম বা মতবাদ আল্লাহ প্রদত্ত ধর্ম বা দীন। তারা পরকালীন জীবনের সবকিছু অস্বীকার করে। পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন মনে করে।

৭. জাবরিয়া মতবাদ :

তারা মনে করে মানুষ ও জড় পদার্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এদের নিজ ইচ্ছায় কাজ-কর্ম করার সামর্থ্য নেই। মানুষকে ভালো কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি কোনোটিই দেয়া হবে না।

৮. কাদরিয়া মতবাদ :

কাদরিয়া অর্থ তাকদীর বা ভাগ্য। কাদরিয়া মতবাদটি জাবরিয়া মতবাদের বিপরীত। অর্থাৎ তারা তাকদীর তথা ভাগ্যকে বিশ্বাস করে না। কাদেরিয়া মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলো সীসাওয়াহ। সে ছিল একজন খ্রিস্টান অগ্নিপূজক। সে ইসলাম গ্রহণ করার পর পুনরায় খ্রিস্টান হয়ে যায়। এ সম্প্রদায়টি খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ দিকে এবং উমাইয়া শাসন আমলের প্রথম দিকে আত্মপ্রকাশ করে। কাবা শরীফে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তি মন্তব্য করে, এটা আল্লাহর ইচ্ছায় ঘটেছে। আরেক দল বলল, আল্লাহ এরূপ পরিকল্পনা করতে পারেন না। এ ঘটনা থেকে বসরার অধিবাসী অগ্নিপূজাক সীসাওয়াহ কাদেরিয়া মতবাদ ছড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে এরা ২২ দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

কাদরিয়াদের স্নায়ুযুদ্ধ :

তারা মনে করে, মানুষ নিজে নিজেই সকল কাজকর্ম করতে সক্ষম। এখানে আল্লাহ বা অন্য কারো হাত বা সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এজন্য এ মতবাদের নাম কাদরিয়া।

৯. জাহমিয়াহ মতবাদ :

তারা মনে করে ঈমান হলো অন্তরের বিষয়, তাই কেউ যদি মুখে অস্বীকার করে তাহলে সে মুমিনই থাকবে; কাফির হয়ে যাবে না। তারা আখেরাতে আল্লাহর দর্শন অস্বীকার করে।

১০. কাদিয়ানী মতবাদ :

ভারত উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদদে সৃষ্ট ভ্রান্ত মতবাদ হলো কাদিয়ানী মতবাদ। এর প্রতিষ্ঠাতা হলো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। সে মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদার। তার অনুসারীরা অমুসলিম ও কাফির।

তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, তৎকালীন ভারতের শাসক ইংরেজদের তোষামোদ করা, যেন তাদের সরকার আরও স্থিতিশীল হয়। অপরদিকে মুসলিমদের দুর্বল বানিয়ে দেয়া। সে ঘোষণা করেছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম এবং তাদের আনুগত্য করা ফরয।

সংকট নিরসনে শিক্ষা

সংকট নিরসনে শিক্ষার বিকল্প নেই। কারণ শিক্ষা একটি সামাজিক কার্যক্রম। সাংস্কৃতি সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষাকে সংরক্ষণ করা হয়। শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়। শিক্ষা সমাজের গতিশীলতা এবং উন্নয়নের প্রতীক। ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞান নির্ভর দীন। সাংস্কৃতিক বাহক হিসেবে একদিকে শিক্ষা হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ ও মূল্যবোধের সমষ্টি, অন্যদিকে এগুলো জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্মেলন।

ইসলামী শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতার সকল স্তরে আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন। বিশ্বের মহান স্রষ্টা মানুষকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে।" [সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬]

এ হিসেবে বলতে হয় ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র জীবনে এক আল্লাহর দাসত্ব করার যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা যে, তারা শিক্ষা লাভ করে যেন প্রকৃত মানুষের মর্যাদা নিয়ে জীবন-যাপন করতে পারে, আল্লাহর দাস হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে সক্ষম হয়। তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনকে আলোকিত ও সুখ-শান্তিতে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। সে শিক্ষার বিষয়বস্তু হচ্ছে এমনসব জ্ঞান যা অর্জন করার মাধ্যমে মানুষের সমগ্র জীবনে এক আল্লাহর দাসত্ব করার যোগ্যতা সৃষ্টি হতে পারে। তাই এক একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে নয়, আল্লাহর দাসত্ব স্বীকারকারী লোকদের সমন্বয়ে গঠিত জাতি হিসেবেও জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য। কারণ ধর্ম

ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী উন্নত চরিত্র গঠন করতে পারে। অতএব যে শিক্ষা মানুষকে মনে-প্রাণে ও বাস্তব জীবনে আল্লাহর দাস বানায় না, আল্লাহর দাস হওয়ার মর্যাদা শেখায় না, আল্লাহর দাস হিসেবে কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করে না এবং আল্লাহর অনুগত দাস হিসেবে ইহকালীন ও পরকালীন জীবন উজ্জ্বল ও সুখময় হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে না তা যেমন উপযোগী শিক্ষা নয়, তেমনি তা ইসলামী শিক্ষাও নয়। বস্তুত ইসলাম মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ বানায়; তাকে পশুর ন্যায় জীবন-যাপন করতে নিষেধ করে এবং তার মনে পশুত্বের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্ট করে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শিক্ষা ছিল আদম সৃষ্টির পর আল্লাহ প্রদত্ত শিক্ষা। যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা সকলেই স্বীয় সম্প্রদায়কে শিক্ষা প্রদান করেছেন।

চরিত্র গঠন শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। আমাদের নবী দীর্ঘ ২৩ বছর শিক্ষা প্রদান করেন। মক্তব শিক্ষা হলো বুনিয়াদি শিক্ষা, কেয়ামত পর্যন্ত এ ধারা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে, যার মাধ্যমে দীনের মৌলিক শিক্ষা দেয়া হয়। তাই ইসলামের শত্রুরা সব সময় ও সর্বাবস্থায় এধরনের শিক্ষা ধ্বংস করার জন্য তাদের কৌশল প্রয়োগ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার পরও মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের দেয়া শিক্ষাব্যবস্থা বিরাজ করছে।

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামকে কটাক্ষ করা ও কুরআনের প্রতি আক্রমণ করা।

পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা

উপনিবেশ যুগে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সেটি ছিলো পাশ্চাত্য ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করে বিজ্ঞানসম্মত জীবনধারা আয়ত্ত করে নিতো। তবে এই শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলাম শিক্ষা বিষয়টি পুরোপুরি বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনে দীন সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার বীজ বপন করে। দীনি শিক্ষার অভাবে নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয় বাড়তেই থাকে, ফলে

শিক্ষার্থীরা মাতৃভূমিকে ভালোবাসার পরিবর্তে পশ্চিমাদের ভালোবাসতে শুরু করে। তাদেরকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতে শুরু করে। শুধু তাই নয় বরং সেই উপনিবেশিকদেরকে আমাদের শিক্ষার্থীরাই সত্যতার ধ্বজাধারী ও পূর্ণজাগরণের প্রবাদ পুরুষ হিসেবে মনে করতে থাকে। তারা আরও ধারণা করতে থাকে যে, উপনিবেশিকরা না আসলে বিভিন্ন দেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হতো না। আর ইসলামই হলো মুসলিম দেশের পশ্চাদপদতার মূল কারণ। তাই তাদের হাতে সুরক্ষিত থাকবে না দেশের সম্পদ, সংস্কৃতি, সুবিচার, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। শিক্ষিত মুসলিম তরুণরা এমন বদলে গেল যেন তারা মুসলিম সন্তানই নয়। এমনকি তারা এমন হয়ে গেল যে, তারা মুসলিম দেশের অধিবাসীও নয়। অথচ তারাই এক সময় উপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তাদের বিতাড়নের প্রচেষ্টা করেছিল এবং তাদেরকে লুটেরা মনে করতো। কিন্তু তারাই আবার উপনিবেশিকদেরকে সভ্যতা ও প্রগতির চালিকাশক্তি মনে করতে শুরু করে। উপনিবেশিক যুগে শিক্ষাব্যবস্থা দীনবিহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজি বিদ্যালয়, ইংরেজি কলেজ এবং ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা এমন প্রজন্ম তৈরি করে যারা দেশাত্মবোধ ও ধর্মানুভূতি থেকে অনেক দূরে সরে আসে এবং মাতৃভূমি সংস্কার করার চিন্তাধারা তাদের কাছ থেকে লোপ পায়।

লর্ডম্যাকলের উক্তি প্রণিধানযোগ্যঃ

বর্তমানে আমাদেরকে এমন একটি শ্রেণি গড়ে তুলতে হবে যারা শাসক ও শোষিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা আকৃতি ও বর্ণে মুসলিম হবে বটে কিন্তু রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরেজ।[২]

খ্রিস্টান মিশনারি প্রধান **যুয়েমর** ইসলামী রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। এই শিক্ষা কার্যক্রম তরুণ শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করে যে, সে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে কিছুই জানে না। তাছাড়া এ শিক্ষাব্যবস্থা উপনিবেশিকদের চাহিদা মতো একজন মুসলিম শিক্ষার্থীকে ইসলাম থেকে বের করে নিয়ে আসছে। শিক্ষার্থীর মন-মানসিকতা এমনভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে যে, শুধু

---

২ ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫৮।

আরাম-আয়েশ এবং অলসতা সে পছন্দ করতে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।[৩]

প্রকৃতপক্ষে উপনিবেশ যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে শিক্ষাব্যবস্থা দিকভ্রষ্ট হয়ে সঠিক ইসলামী পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। উপনিবেশ যুগে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন ছিল উপনিবেশ পরবর্তী যুগেও তেমনি রয়ে গেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর তরুণদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে অবিশ্বাস ও নাস্তিকতার দিকে ধাবিত করে দক্ষ ক্যাডার পরিণত করা।

মুসলিম শিক্ষিত যুবকরা যথাযথ সিলেবাস অনুসরণ ও দক্ষ শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়ত্ত করে নেয়। কিন্তু তারা দীন সম্পর্কে থাকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তবে ইসলাম ও ইসলামের আলো সম্পর্কে ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এতে করে তাদের মনে সন্দেহের বীজ বপন হয়। ফলে এসব মুসলিম যুবক নিজ ধর্ম ও জন্মভূমিকে আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন অনুভব করে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি

- মানুষকে তার স্রষ্টা তথা মহান আল্লাহর দাস হিসেবে তৈরি করা।
- দীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধি হাসিল করা।
- সত্যকে জানা ও সঠিক পথের সন্ধান লাভ করা।
- তাওহীদের জ্ঞানার্জন করা।
- পরকালের জ্ঞান অর্জন এবং পরকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা সম্পর্কে সচেতন হওয়া।
- আল্লাহর পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী হওয়া।
- কর্ম-কৌশল ও দক্ষতা লাভ করা।
- মানসিক, আর্থিক ও নৈতিক উৎকর্ষতা লাভ করা।
- মানব সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার যোগ্যতা অর্জন করা।
- আল্লাহ প্রদত্ত জীবন-বিধানের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

---

৩ মুসলিম কনট্রিবিউশন টুসাইন্স এন্ড টেকনোলজি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৪৬৩।

স্নায়ুযুদ্ধের কবল থেকে মুক্তির উপায়

আমাদের সমাজ ও দেশে যে অধঃপতন নেমে এসেছে তার জন্য আমরাই দায়ী। কারণ এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তাতে আমরা শিথিলতা প্রদর্শন করছি। আগে থেকেই এ ব্যাপারে সকলকে সাবধান ও সতর্ক করা প্রয়োজন ছিল।

১. আমাদেরকে সমস্যা উপলব্ধি করতে হবে

সমস্যা উপলব্ধি না করলে সমাধানের প্রশ্নই উঠে না। এজন্য বলা হয় সমস্যা উপলব্ধি সমাধানের অর্ধাংশ।

সমস্যা উপলব্ধির সাথে সাথে সমস্যা সৃষ্টির কারণ চিহ্নিত করতে হবে। অন্যথায় সঠিক পথ নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

অতএব, আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমরা ভয়াবহ স্নায়ুযুদ্ধের শিকার এবং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দীন হতে সরে পড়া।

আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, এই স্নায়ুযুদ্ধের মোকাবেলা সম্ভব ও সহজ। ইসলামের শত্রুরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যত কৌশল অবলম্বন করুক না কেন, আল্লাহর শক্তির তুলনায় তারা কিছুই না।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ কোনো শত্রুকে ধ্বংস করেছেন মশা দিয়ে, কোনো জাতিকে ধ্বংস করেছেন পানি দিয়ে, কাউকে বাতাস দিয়ে, কাউকে পাথর দিয়ে, কাউকে ফেরেশতা দিয়ে, আবার কাউকে ক্ষুদ্র ভাইরাস দিয়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

"আর আমাদের দায়িত্ব তো মুমিনদের সাহায্য করা।" [সূরা আর-রূম: ৪৭]

আমাদের প্রয়োজন তো সেই আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করা। কেউ হয় তো মনে করতে পারে যে, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এক একটি পরাশক্তি। এদের মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈমানের দুর্বলতার কারণেই তারা তথাকথিত পরাশক্তির সামনে নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করে। অথচ তারা যদি আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও অগণিত অদৃশ্য বাহিনীর কথা চিন্তা করত– যার হিসাব একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন তাহলে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হতো যে, আল্লাহর নির্দেশে সামান্য একটি ভূমিকম্প তামাম পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا

"নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেন।" [সূরা আল-হাজ্জ: ৩৮]

সুতরাং মুসলিমদের এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে, আমাদের জন্য আল্লাহর অসংখ্য বাহিনী যথেষ্ট, যে বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করার সাধ্য কোনো পরাশক্তির নেই। তথাপি আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে আসবাব গ্রহণ করতে হবে।

আমরা বলতে পারি যে, মুসলিমদের প্রকৃত শক্তি হচ্ছে ঈমান ও আকীদাগত শক্তি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"যদি তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অটল অবিচল রাখবেন।" [সূরা মুহাম্মদ: ৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" [সূরা আলে ইমরান: ১৩৯]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার এ অভয়বাণীকে সামনে রেখে নির্ভীকভাবে এগিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।

২. আল্লাহর দীন ও তাঁর কিতাবকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরতে হবে

দীন ইসলাম আঁকড়ে ধরে আমরা প্রবল ক্ষমতার অধিকারী হতে পারি। আমাদের দীনে যেমন রয়েছে ধর্মীয় বিধি-বিধান, তেমনি রয়েছে যাবতীয় বৈষয়িক সমস্যার সুষম সমাধান, যা কেয়ামত পর্যন্ত জীবনপথের বিস্তৃত পরিসরে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং তাতে রয়েছে সকল বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ، سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا».

"তোমরা সৎকাজের প্রতি অগ্রসর হও। অতিসত্বর অন্ধকার রাতের টুকরার ন্যায় ফিৎনা আগমন করবে। ঐ সময়ে যে ব্যক্তি সকাল বেলায় মুমিন থাকবে সে সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় মুমিন থাকবে সে সকালে কাফের হয়ে যাবে। সে তার দীনকে দুনিয়ার সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করে দিবে।[৪]

এখান থেকে মুক্তির উপায় কী? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ».

"আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যদি তোমরা সে দুটিকে আকড়ে ধরে রাখতে পারো তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ তথা হাদিস।"[৫]

---

৪ মুসলিম: ১১৮, তিরমিযী: ২১৯৫, আশ-শারীআতু লিল আজুররী: ৮০।

৫ মুয়াত্তা মালিক: ৩৩৩৮।

৩. মুসলিম উম্মাহকে মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্ব ফিরিয়ে আনতে কাজ করতে হবে।

ইসলাম জীবন্ত ধর্ম, তা ছিল, আছে ও থাকবে। বাতিলকে প্রতিহত করার ক্ষমতা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর প্রভাব চলতেই থাকবে।

যুব সমাজকে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য একটা সঠিক প্লান করতে হবে। যাতে করে ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তিগুলোর জ্ঞান তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়। তাদের শিক্ষা দিতে হবে ইসলামের কৃষ্টি-কালচার ও ইতিহাস, তাদের জানাতে হবে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সাথে সাথে তাদের কাছে উন্মোচন করতে হবে বিশ্বে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। যাতে করে তারা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলো তাদের কাছে ফুটে ওঠে।

মুসলিমদের ঘরে সমস্ত শিক্ষার সিলেবাসকে এমনভাবে সাজাতে হবে ও এমনভাবে সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ করতে হবে যাতে এই মহা বিপর্যয়ের বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। মুসলিম কলেজ, ইউনির্ভাসিটি ও মাদরাসার এই স্নায়ুযুদ্ধ বিষয়টি এমনভাবে পাঠদান করা, যাতে প্রত্যেকের চক্ষু ও ব্রেন খুলে যায় এবং সদা সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকে।

শাসনব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরিবারব্যবস্থাকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সাজাতে হবে।

উপনিবেশ, প্রাচ্যবাদ ও বিশ্বায়ন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যাতে করে তাদের ষড়যন্ত্রগুলো যথাযথ প্রতিহত করা যায়।

৪. দীনের ওপর অটল অবিচল থাকতে হবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ

"অতঃপর আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।" [সূরা আল-আনকাবুত: ৩]

যারা সত্যবাদী, শত বিপদের সময়ও তারা দীনের ওপর অবিচল থাকে। আর যারা মিথ্যাশ্রয়ী, বিপদের সময় তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায়।

সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতা তো দাবি করে প্রমাণ করার বিষয় নয় যে, আমার ঈমান ঠিক, আমার অন্তর পরিষ্কার ইত্যাদি। তার কর্মের দ্বারা তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। বরং সত্যবাদিতা হলো কঠিন বাস্তবতা যা প্রমাণিত হয় বাস্তব জীবনে বিপদ ও মুসীবতের মুখোমুখি হলে।

এ বিপদ দু' ধরনের হয়ে থাকে, ছোট ও বড়। দীনের ওপর চলতে গিয়ে পরিবারস্থ লোকজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দিক থেকে যেসব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো ছোট বিপদ। আর জেল-যুলুম, হত্যা, নির্যাতন ইত্যকার মুসিবত হলো বড় বিপদ। ছোট হোক আর বড় হোক দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাধা-বিপত্তি ও বিপদাপদের সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। এসব বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে এবং সকল পরিক্ষায় জয়লাভ করেই অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই দীন প্রতিষ্ঠার পথে কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করার জন্য সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা দীনের পথ হলো কন্টকময়, বন্ধুর। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِهِ».

"জাহান্নামকে প্রবৃত্তির কামনা দ্বারা, আর জান্নাতকে কষ্ট-ক্লেশ দ্বারা বেষ্টন করা হয়েছে।"[৬]

অর্থাৎ যেসব কর্মের পরিণতিতে মানুষ জাহান্নামে যাবে, তার সবগুলোই বাহ্যিকভাবে সুন্দর ও মনোগ্রাহী। নফস বা প্রবৃত্তি এগুলোকে খুবই পছন্দ করে। এজন্য জাহান্নামের পথ অতি সহজ। আর যেসব কর্মগুণে মানুষ জান্নাতের অধিকারী হবে, সেগুলো কঠিন ও কষ্টকর। প্রবৃত্তি কখনো তা করতে চায় না। এজন্য জান্নাতের রাস্তা কঠিন ও বিপদসংকুল। তাই জান্নাত প্রত্যাশী ঈমানদারদের বিপদাপদে মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

---

৬ বুখারী: ৬৪৮৭।

৫. ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

সকল ঐতিহাসিক ঘটনা মনে আশার সঞ্চার করে যে, বর্তমান অবস্থাও অতি দ্রুত পরিবর্তন হবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে যদি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মাঝে নিজের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়, তাহলে আমাদেরকে হতাশায় নিমজ্জিত করবে। ইতিহাসের ঘটনাবলি গভীরভাবে আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত। তাহলে ঈমানী প্রেরণা সৃষ্টি হবে এবং অন্তরে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

"অতএব, হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।" [সূরা আল-হাশর: ২]

৬. উচ্চাকাঙ্ক্ষা করতে হবে

বর্তমান মুসলিমদের অনেকের মাঝেই লক্ষ্য করা যায় যে, তাদের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা অতি ক্ষুদ্র ও সীমিত। বড় ধরনের কোনো আশা পোষণ করে না বিধায় উন্নতির শিখরে পৌঁছা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একবার তিনি তাঁর এক ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কার মতো হতে চাও? ছেলে বলল: আমি আপনার মতো হতে চাই। আলী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন: না, বরং বল, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো হতে চাই। কেননা তোমার অভীষ্ট লক্ষ্য যদি হয় আলী, তাহলে তুমি হয়ত আলীর স্তরে পৌঁছতে পারবে না। কিন্তু তোমার লক্ষ্য যদি হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাকেই যদি তুমি অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করো তাহলে তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো না হলেও অসম্ভব নয় যে, তুমি আলীকে অতিক্রম করে যাবে।[৭]

---

৬ لهزيمة النفسية عند المسلمين عبد الله الخاطر

৭. বিজাতীয় অনুকরণ পরিহার করতে হবে

কোনো জাতি যখন অন্য জাতির কাছে পরাজিত হয়, তখন সে বিজয়ী জাতির সাংস্কৃতির অনুসরণ করতে শুরু করে। বিজিত সর্বদা বিজয়ীর অন্ধানুকরণের দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতিসহ সর্বক্ষেত্রেই বিজিত জাতি বিজয়ীর অন্ধানুকরণ করতে শুরু করে। কেননা মানুষের স্বভাব হলো, সে বিজয়ীর মাঝে সর্বদা পূর্ণতাই দেখতে পায়। বিজয়ীর জয় পরাজিতের মনে এই বিশ্বসাই জন্ম দেয় যে, বিজয়ী কোনো সাধারণ ক্ষমতায় বিজয় লাভ করেনি, বরং সে তার আদর্শিক ও সাংস্কৃতিক পূর্ণতার কারণেই বিজয়ী হয়েছে। এজন্য পরাজিত পক্ষ বিজয়ী শিক্ষা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে নেয়।

মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থাকে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায়, মানসিক এ দুর্বলতা তথা বিজয়ীর অন্ধানুকরণ বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মাঝে পুরোপুরিই বিদ্যমান। তারা সবক্ষেত্রেই বিজাতির অন্ধানুসরণ করে চলছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

"আর ইয়াহুদী ও নাসারারা আপনার প্রতি কখনো সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ করেন।" [সূরা আল-বাকারা: ১২০]

৮. বর্তমান টেকনোলজিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে

আমাদের শত্রুরা প্রযুক্তিতে অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন করেছে। হয়তো কেউ ধারণা করতে পারে যে, তারা এর মাধ্যমে আমাদেরকে তাদের মোকাবেলা করতে অপারগ করে দিবে। এটা আমি মনে করি না। কারণ আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তবে আমাদের প্রয়োজন সাধ্যমত আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নতি সাধন করা। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَعِدُّوْا لَهُم مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ.

“আর তোমরা তাদের মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত রাখ শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী, তা দিয়ে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্‌র শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে। [সূরা আল-আনফাল: ৬০]

অতএব আজ মুসলিমদেরকে সব ধরনের প্রযুক্তি ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

৯. আমাদের মাঝে ছোট-খাটো পার্থক্য ভুলে যাওয়া

মুসলিমদের ঐক্য একটি বিরাট শক্তি। ইসলামের শত্রুরা তা যথাযথ উপলব্ধি করতে পেরে আমাদের মাঝে ঐক্য বিনষ্টে সর্বদা ষড়যন্ত্র করছে। এ ব্যপারে অবশ্যই আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঐক্য অটুট রাখার যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থ পেছনে ফেলে মুসলিমদেরকে এক প্লাটফর্মে একতাবদ্ধ হতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থ: আর তোমরা একযোগে আল্লাহর রজ্জু সুদৃঢ়রূপে ধারণ করো বিভক্ত হইও না। [সূরা আলে ইমরান: ১০৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

“মুমিনদের উদাহরণ তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়াদ্রতা ও সহানুভূতির দিক থেকে একটি মানব দেহের ন্যায়, যখন তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয় তখন তার সমস্ত দেহ ডেকে আনে জ্বর ও অনিদ্রা।”[৮]

---

৮ মুসলিম: ২৫৮৬।

আমাদেরকে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতে হবে যে, ভবিষ্যৎ একমাত্র ইসলামেরই। এটাই আল্লাহর অঙ্গীকার। কুরআনের বহু আয়াত, রাসূলের অসংখ্য হাদিসে আল্লাহর অঙ্গীকার তথা ইসলামের বিজয়ের সুসংবাদ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। মুসলিমদের বর্তমান অবস্থাও প্রমাণ করেছে যে, সেই শুভক্ষণ সন্নিকটে। তারা অতি দ্রুত সেই সোনালী যুগের দিকে প্রত্যাবর্তন করছে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا.

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কর্ম করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। [সূরা আন-নূর: ৫৫]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের হাতে পৃথিবীর শাসনভার অর্পণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তবে শর্তারোপ করেছেন ঈমান ও সৎ-কর্মপরায়ণতার। কাজেই এ শর্ত দুটি পূরণ না করলে উক্ত শুভ সংবাদের অধিকারী হওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন:

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ».

কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে। মুসলিমরা এত বীর বিক্রমে লড়াই করবে যে, ইয়াহুদীরা পালিয়ে পাথর ও বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় নিবে। আর তখন পাথর ও বৃক্ষ বলবে: হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা! এই দেখ, আমার পিছনে ইয়াহুদী! এসো, এদের হত্যা করো! কিন্তু 'গারক্বাদ'। গারক্বাদ বৃক্ষ এমন আহ্বান জানাবে না। কারণ এটি ইয়াহুদীদের গাছ।[৯]

এটা সুস্পষ্ট যে, এ হাদিসে বর্ণিত সময়কাল এখনো অতিবাহিত হয়নি। তাই বলছি, ভবিষ্যৎ একমাত্র আমাদের। সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا».

"আল্লাহ কিছুক্ষণের জন্য আমার সম্মুখে গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করেন, তখন আমি পৃথিবীর প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অবলোকন করি। আমার দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে ততদূর পর্যন্ত অবশ্যই আমার উম্মতের শাসন কর্তৃত্ব বিস্তৃত লাভ করবে...।"[১০]

এ হাদিসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, অচিরেই মুসলিম উম্মাহর শাসন কর্তৃত্ব সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত লাভ করবে। কেননা বর্ণিত হাদিসে যতদূর বলতে সমগ্র পৃথিবীকে বুঝানো হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী মুসলিমদের করতলে আসেনি। সুতরাং আমরা দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি যে, নিশ্চয় অদূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্বে মুসলিমদের শাসন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ।

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

---

৯ মুসলিম: ২৯২২।

১০ মুসলিম : ২৮৮৯।

«لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ».

"দিন-রাতের আবর্তন যে পর্যন্ত রয়েছে, দীন ইসলাম সে পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে। কাঁচা-পাকা কোনো ঘর অবশিষ্ট থাকবে না। সম্মানিতকে সম্মান দিয়ে আর অপদস্তকে অপমানিত করে এ দীনকে আল্লাহ ত'আলা সর্বত্রই প্রতিষ্ঠা করবেন। ইসলামকে করবেন সম্মানিত, আর কুফরকে করবেন লাঞ্ছিত।[১১]

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ ثُمَّ سَكَتَ».

"নবুওয়াত ব্যবস্থা তোমাদের মাঝে ততদিন থাকবে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা মঞ্জুর করেন। অতঃপর যখন ইচ্ছা তখন তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর তোমাদের মাঝে নবুওয়াতের তরিকায়ে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে এবং তা আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন। তারপর হানাহানির রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে এবং তা আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তার বিলুপ্তি ঘটবে। তারপর জবরদখল তথা আধিপত্য বিস্তারের রাজত্ব কায়েম হবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়াতে

---

১১ মুসনাদে আহমদ (২৮/১৫৫)। শাইখ আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন।

কিছুকাল বিরাজমান থাকবে। তারপর যখন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, তখন এরও অবসান ঘটবে। অতঃপর নবুওয়াতের তরিকায় খিলাফত রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হবে। এ বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন।[১২]

«ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ»

“অতঃপর নবুওয়াতের তরিকায় খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম হবে” নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি প্রমাণ করে যে, সারা বিশ্বে ইসলামী শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে। রাজত্বের লাগাম মুসলিমদের হস্তগত হবে। কখনো এর ব্যতিক্রম হবে না। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা যথা সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

---

১২ মুসনাদে আহমদ : ১৮৪০৬।

المراجع والمصادر (তথ্যসূত্র)

١ - لغزو لفكرى أهد فه و وسائله للدكنؤر عبد لصبور مرز

٢ - أجنة لمكر لثلاث لعبد لر حمن حسن حنبكه لميد نى

٣ - أساليب لغزو لفكر للعالم لإسلامى على أو جريشة

٤ - لتغريب أخطر لتحديات فى وجه لإسلا لانو ر لجندى

٥ - لإسلا لعصر نا جعفر شيخ ريس

٦ - لهزيمة لنفسية عند لمسلمين عبدالله لخاطر

٧ - لعلمانية وثمار ها لخبيثة : محمد شاكر لشريف

৮. বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রুসেড, মাওলানা ইসমাঈল রাইহান

৯. মুসলিম দর্শন ও দার্শনিক, ড. মোঃ ইব্রাহিম খলিল

১০. শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রাহিম।

১১. মহা নবীর জীবন চরিত্র, ড. মুহাম্মদ হুসাইন হায়কল।

১২. মোস্তফা চরিত্র, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ।

১৩. সীরাত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

ড. মুহাম্মাদ ওসমান গনি কর্তৃক রচিত ও অনূবাদিত কিছু বই

১. ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান
২. মহান স্রষ্টার একত্ববাদ ও আধুনিক বিজ্ঞান
৩. আল্লাহর বাণী আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান
৪. আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক নির্দেশাবলী
৫. বিরিসিরি এলাকায় খৃষ্টান মিশনারীর তৎপরতা
৬-৭. তালীমূল মুহাদাছাহ লিল আতফাল (১ম-২য় খণ্ড)
৮. তালীমূল আরাবিয়া শিশু শ্রেণী
৯.-১৪. তালীমুল আরাবিয়া লিল আতফাল (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১৫-১৭. তালীমূল কাওয়ায়েলিদ আরাবিয়া লিল আতফাল (১ম-৩য় খণ্ড)
১৮. কুরআন সুন্নাহের আলোকে ইয়াতিম প্রতিপালন
১৯. সকাল সন্ধ্যার যিকির
২০. কুরআন পাঠের সহজ পদ্ধতি
২১. মিথ্যার কুফল ও বেঁচে থাকার উপায়
২২. দায়ীদের প্রতি পয়গাম
২৩. আমি কেন নামাজ আদায় করব?
২৪. জামা'আতে ছালাত এর ফযীলত, আদব ও হুকুম
২৫. জুমা'আর ছালাত এর ফযীলত, আদব ও হুকুম
২৬. নাজাতের পথ
২৭. হজ্জ ও উমরার বৈশিষ্ট্য
২৮. পর্দা কেন?
২৯. প্রবৃত্তির অনুসরণ
৩০. ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে মুসলিম নারী
৩১. ঘুষের কুফল ও বেঁচে থাকার উপায়
৩২. ইসলামের আলো ও আধুনিক বিজ্ঞান
৩৩. নবী (সঃ) এর ভালবাসা কোন পথে?
৩৪. নাস্তিক অস্বীকার করে কেন?
৩৫. সুদের ভীতি প্রদর্শন